রূপালী পাঠ

২



দক্ষিণারঞ্জন বসু

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক অনুমোদিত

Vide T. B. No/76/7/ T. B./2, Dated 24. 12. 76.

রূপালী পাঠ

সপ্তম শ্রেণীর বালক-বালিকাদিগের জন্য

পর্ষৎ বার্তায় লিখিত আদর্শ গ্রন্থের অনুসরণে একমাত্র পুস্তক

সম্পাদনায়: **দক্ষিণারঞ্জন বসু**

প্রাক্তন অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ; কবি ও সাহিত্যিক, প্রাক্তন বার্তা সম্পাদক ; যুগান্তর ; কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত।



S.C.E.R.T. West Bengal Library Calcutta 25/3, B. C. Road

মণ্ডল এণ্ড সন্স

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক

891.441
DAK

সূচীপত্র

পদ্যাংশ

S7
DHA

সূচীপত্র

গদ্যাংশ

S.C.E.R.T., West Bengal Library
Calcutta
25/3, B. T. Road

...R.T., West Benga...
14/1/92
... No 5120

প্রথম প্রকাশ ঃ শুভ জগদ্ধাত্রী পূজা, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ শুভ শিবচতুর্দশী, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ
তৃতীয় প্রকাশ ঃ শুভ শিবচতুর্দশী, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ
চতুর্থ প্রকাশ ঃ শুভ শিবচতুর্দশী, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ
পঞ্চম প্রকাশ ঃ শুভ জন্মাষ্টমী, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ
ষষ্ঠ প্রকাশ ঃ শুভ শিবচতুর্দশী, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ
সপ্তম প্রকাশ ঃ পৌষ পূর্ণিমা, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ
অষ্টম প্রকাশ ঃ পৌষ পূর্ণিমা, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ
নবম মুদ্রণ জানুয়ারী— ১৯৮৩
দশম মুদ্রণ ঃ জানুয়ারী, ১৯৮৪

মূল্য: ৫-৩০ পয়সা মাত্র

MANDAL & SONS
Rs-6.50
CALCUTTA



ছবি : স্বপন দেবনাথ

শ্রীসুধীরকুমার মণ্ডল কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীপরিমল চন্দ্র কর্তৃক আর্ট পুল, ১২/১ লিণ্ডসে স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০১৬ হইতে ফটো কম্পোজিং এবং এস্ আ্যান্ট্র্ল এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত।

রাম ভরতের মিলন

কৃত্তিবাস ওঝা



বিষয় পরিচিতি : এ কাহিনী যে 'রামায়ণ' থেকে নেওয়া হয়েছে, তা কোন ভারতীয় ছাত্রছাত্রীকে বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। পিতৃসত্য পালন করতে রামচন্দ্র সিংহাসন ছেড়ে বনে গিয়েছেন, এই সংবাদ শুনে ভরত খুবই দুঃখিত হন। তখন রামচন্দ্র বাস করছিলেন চিত্রকূট পর্বতে। তাঁকে ফিরিয়ে আনবার জন্য ভরত গেলেন সেখানে। দুই ভাই-এর মিলনের দৃশ্য এবং তখনকার কথোপকথনই আলোচ্য অংশের বর্ণনার বিষয়।

ভরত কহেন ধরি রামের চরণ।
কার বাক্যে রাজ্য ছাড়ি বনে আগমন।।
অপরাধ ক্ষমা কর, চল প্রভু দেশ।
সিংহাসনে বসিয়া ঘুচাও মনঃক্লেশ।।
অযোধ্যাভূষণ তুমি অযোধ্যার সার।
তোমা বিনে অযোধ্যা দিবসে অন্ধকার।।
চল প্রভু অযোধ্যায় লহ রাজ্য ভার।
দাসবৎ কর্ম করি আজ্ঞা অনুসার।।
শ্রীরাম বলেন তুমি ভরত পন্ডিত।
না বুঝিয়া কেন বল এ নহে উচিৎ।।
মিথ্যা অনুযোগ কেন কর বিমাতার।
বনে আইলাম আমি আজ্ঞায় পিতার।।
চতুর্দশ বৎসর পালিয়া পিতৃবাক্য।
অযোধ্যা যাইব আমি দেখিবা প্রত্যক্ষ।।

শ্রীরামেরে বলেন বশিষ্ঠ মহাশয়।
ভরতের প্রতি রাম কি অনুজ্ঞা হয়।।
তোমা বিনা ভরতের আর নাহি গতি।
বুঝিয়া ভরতে রাম কর অনুমতি।।
শ্রীরাম বলেন মুনি হইলাম সুখী।
প্রাণের অধিক আমি ভরতেরে দেখি।।
ভরতে আমাতে নাহি করি অন্যভাব।
ভরতের রাজত্বে আমার রাজ্যলাভ।।
যাও ভাই ভরত ত্বরিতে অযোধ্যায়।
মন্ত্রিগণ লয়ে রাজ্য করহ তথায়।।
যোড়হাতে ভরত বলেন সবিনয়।
কেমন রাখিব রাজ্য মম কার্য নয়।।
তোমার পাদুকা দেহ করি গিয়া রাজা।
তবে সে পারিব রাম পালিবারে প্রজা।।
তোমার পাদুকা যদি থাকে রাম ঘরে।
ত্রিভুবনে ভরত কাহারে নাহি ডরে।।
শ্রীরাম বলেন হে ভরত প্রাণাধিক।
পাদুকা লইয়া যাও, কি কব অধিক।।
নন্দীগ্রামে পাট করি কর রাজকার্য।
সাবধান হইয়া পালহ পিতৃরাজ্য।।
শ্রীরামের পাদুকা ভরত শিরে ধরে।
ভাবে পুলকিত অংগ প্রফুল্ল অন্তরে।।
পাদুকার অভিষেক করিয়া তথায়।
চলিলেন ভরত শ্রীরামের আজ্ঞায়।।

।। পাঠ সহায়িকা ।।

বিষয় উৎস : আলোচ্য অংশটি কৃত্তিবাসের রামায়ণ (সাহিত্য-সংসদ সংস্করণ)-এর অযোধ্যাকান্ডের থেকে নেওয়া হয়েছে।

ছন্দ ।। এই অংশ পয়ার ছন্দে রচিত। তবে তোমরা অবশ্যই গল্প বর্ণনার মত করে পড়বে এবং আবৃত্তি করবে।

আলোচনা ।। এখানে রাম ভরত ও বশিষ্ট চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনটি চরিত্র ও সেকালের রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার সম্পর্কে যা জানা যায় তা বুঝতে চেষ্টা করবে।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন [প্রতিটি দশ নম্বর]

১। ভরত কিভাবে রামকে কি অনুরোধ করেন ? ইহার উত্তরে রামচন্দ্র কি বললেন ? রামচন্দ্র তাঁহার বনে আগমনের কি কারণ দেখান ?

[৪+৪+২]

২। "কেমনে রাখিব রাজ্য, মম কার্য নয়।"–একথা কে কাহাকে বলেন ? রাজ্য রাখিবার কি উপায় তিনি বলেন ? কিরূপে রাজ্য রাখবার ব্যবস্থা হয় ?

[২+৪+৪]

৩। "রাম ভরতের মিলন" কবিতায় তুমি কয়জন ব্যক্তিকে কথা বলিতে দেখিলে ? তাহাদের নাম বল এবং তাহাদের পরিচয় দাও।

[৩+৭]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন [প্রতিটি তিন নম্বর]

১। "অযোধ্যাভূষণ তুমি, অযোধ্যার সার।"–অযোধ্যার রাজা কে ছিলেন ? এখানে অযোধ্যার ভূষণ কাহাকে বলা হইয়াছে ? এইরূপ বলার কারণ কি ?

[১+১+১]

২। "মিথ্যা অনুযোগ কেন কর বিমাতার।"–বিমাতা কে ? তাঁহার প্রতি অভিযোগ কি ? অভিযোগকে মিথ্যা বলার কারণ কি ?

[১+১+১]

৩। "ভাবে পুলকিত অংগ প্রফুল্ল অন্তরে।"–কে এরূপ ভাবেন ? কেন তাঁহার এইরূপ পুলক হইল ?

[১+২]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন [প্রতিটি আট নম্বর]

১। "অযোধ্যাভূষণ তুমি অযোধ্যার সার।
তোমা বিনে অযোধ্যা দিবসে অন্ধকার।"

এ কথা কাহার রচিত কোন্ কবিতার অন্তর্গত ? কে কোন্ প্রসংগে এই কথা বলেন ? অযোধ্যার 'ভূষণ' ও 'সার' বলার বিশেষ অর্থ কি ? 'দিবসে অন্ধকার' বলিতে কি বুঝান হইয়াছে ? দুই পংক্তির মধ্যে অর্থগত মিল কোথায় ?

[২+২+১+১+২]

২। "তোমার পাদুকা যদি থাকে রাম ঘরে।
ত্রিভুবনে ভরত কাহারে নাহি ডরে।"

কাহার রচিত কোন্ কবিতা হইতে উপরিউক্ত পংক্তিদ্বয় উদ্ধৃত ? কে কোন্ প্রসংগে এই কথা বলেন ? পাদুকা রাম ঘরে কেন থাকিবে ? ত্রিভুবনে ভয়ই বা থাকিবে না কেন ?

[২+২+২+২]

বিষয় বস্তু। রামচন্দ্র বনবাসে যাবার পর ভরত তাঁকে ফিরিয়ে আনবার জন্য বনে গিয়েছিলেন – রামচন্দ্র ভরতকে নানা ভাবে বুঝিয়ে,
ভরতের প্রভু- শান্ত করেন। অতঃপর ভরত শ্রীরামের কাছ থেকে তাঁর পাদুকা
ভক্তি। ভিক্ষা করেন এবং রামচন্দ্রের পাদুকাকে সিংহাসনে তাঁর প্রতিনিধি রূপে স্থাপন করে তাঁহার নির্দেশ পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রেমপূর্ণ চিত্তে ফিরে আসেন।

বঙ্গভূমির প্রতি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বিষয় পরিচিতি : কবি হিসাবে খ্যাতিলাভ করবার প্রবল বাসনা ছিল মধুসূদন দত্তের। এজন্য তিনি জীবনে সকল প্রকার কষ্ট ও ত্যাগ-স্বীকার করেছেন। তবু তাঁর আশংকা যায়নি। এ কবিতায় তাই কবির মিনতি : হে বংগভূমি ! তোমার মনঃকোকনদকে মধুহীন করো না ! তাকে ঠাঁই দিও কবি হিসাবে।

রেখো, মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে।
প্রবাসে দৈবের বশে, জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে,–নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে ?
কিন্তু যদি রাখ মনে, নাহি, মা, ডরি শমনে ;
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে।
সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন ;
কিন্তু কোন্ গুণ আছে, যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ, গো, শ্যাম্যা জন্মদে !
তবে যদি দয়া কর, ভুলে দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে !–
ফুটি যেন স্মৃতিজলে, মানসে, মা যথা ফলে,
মধুময় তামরস কি বসন্তে, কি শরদে !



মূল বক্তব্য।। পরিশীলিত কবিতা, স্বদেশ প্রীতির একটি পরিচয় প্রকাশিত। দূর-প্রবাসে কবি মাতৃভূমির এবং [illegible] জন্য কাতর, কবির একান্ত প্রার্থনা বঙ্গভূমি যেন কবিকে স্মরণে রাখেন। কবি [illegible] যে বঙ্গভূমি তাঁহাকে যে কোনো [illegible]রাগালী পাঠ করে।

।। পাঠ-সহায়িকা ।।

উৎস ।। আমরা আলোচ্য কবিতার পাঠ গ্রহণ করেছি 'হরফ' প্রকাশিত মধুসূদন রচনাবলী থেকে। এটি একটি অপ্রকাশিত কবিতা।

আলোচনা ।। কবিতাটির উপরে কবি এক পংক্তি ইংরাজী কবিতা সংযুক্ত করেছিলেন। "My native land, Good Night !"–Byron.

এ কবিতায় কবির আক্ষেপ এবং আকূতি লক্ষ্য করবার মত। জীবন শেষ হয়ে এল, কবে মৃত্যু হবে কে জানে ! ওগো বঙ্গভূমি, তুমি কি ভুলে যাবে আমাকে !

কবির করুণ আকুতি আজও আমাদের মনকে দোলা দেয়।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন [প্রতিটি দশ নম্বর]

১। 'বঙ্গভূমির প্রতি কবিতায়' কবির নিবেদন কি ? তিনি কেন এইরূপ নিবেদন রাখিয়াছেন ? সমস্ত কবিতায় কবি জীবনকে কি কি জিনিসের সহিত তুলনা করিয়াছেন ? [৩+৩+৪]

২। কবির চিন্তায় কোন্ ব্যক্তি নরকূলে ধন্য হয় ? কবি কিরূপে ধন্য হইতে পারেন বলিয়া মনে করেন ? কবি বঙ্গভূমিকে কি কি সম্বোধন করিয়াছেন ? সম্বোধনগুলির কারণ ও অর্থ বল। [২+২+২+৪]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন [প্রতিটি তিন নম্বর]

১। "প্রবাসে দৈবের বশে, জীবতারা যদি খসে"–অংশটির অর্থ বল। কবি কেন এইরূপ বলিয়াছেন ? [২+১]

২। "বর দেহ দাসে"–কে কাহার নিকট কি বর প্রার্থনা করিয়াছেন ? [১+২]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন [প্রতিটি আট নম্বর]

১। "জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে.....জীবন নদে।"
এ পংক্তিটি কাহার রচিত কোন্ কবিতার অন্তর্গত ? কোন্ প্রসঙ্গে কবি এই কথা বলেন ? জন্ম ও মৃত্যুর সহিত জীবনের সম্পর্ক কি ? জীবনকে এই প্রসঙ্গে নদের সহিত তুলনার সার্থকতা কোথায়। [২+২+২+২]

২। "সেই ধন্য নরকূলে.....সর্বজন।"
কবি কোন্ আকাঙ্ক্ষার কথা বলিতে গিয়া এই কথা বলিয়াছেন ? মনকে মন্দিরের সহিত তুলনার কারণ কি ? কবি 'সেবে' শব্দটা প্রয়োগ করিয়া কি বলিতে চাহিয়াছিলেন ? [৩+৩+২]



সংকল্প সাধন

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিষয় পরিচিতি : এটি একটি উপদেশাত্মক কবিতা। একে কবির জীবনের উপলব্ধিও বলতে পারা যায়। সংকল্পকে কাজে পরিণত করতে গেলে একাগ্র মনে, নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করা ভিন্ন আর কি পথ আছে? কবি আলোচ্য কবিতায় সেই বক্তব্যই রেখেছেন।

দিন যায় ক্ষণ যায়, সময় কাহারো নয়,
বেগে ধায়, নাহি রয় স্থির!
সহায় সম্পদ বল, সকলি ঘুচায় কাল,
আয়ু যেন শৈবালের নীর ।।

সংসার সমরাঙ্গনে যুদ্ধকর দৃঢ়পণে,
ভয়ে ভীত হয়ো না মানব।
কর যুদ্ধ বীর্যবান, যায় যাবে যাক প্রাণ,
মহিমাই জগতে দুর্লভ ।।

মনোহর মূর্তি হেরে, ওহে জীব অন্ধকারে,
ভবিষ্যতে করো না নির্ভর।
অতীত সুখের দিনে, পুনঃ আর ডেকে এনে,
চিন্তা করে হয়ো না কাতর ।।

সাধিতে আপন ব্রত, স্বীয় কার্যে হও রত,
একমনে ডাক ভগবান।
সংকল্প সাধন হবে, ধরাতলে কীর্তি রবে
সময়ের সার বর্তমান ।।

উত্তর॥ সময়ের সদ্ব্যবহার দ্বারা সার্থক হতে ও কর্ম সাধন করবার জন্য কবিতায় আমাদের আহ্বান জানান হয়েছে, সংসার সমরাঙ্গনে যুদ্ধ ক্ষেত্রের তুলনা করে বর্ণনা করা হয়েছে।

।। পাঠ-সহায়িকা ।।

ছন্দ ।। এটি ত্রিপদী জাতীয় কবিতা। লক্ষ্য কর, প্রথম চরণে দুটি অংশ। এদের মধ্যে অন্ত্যমিল আছে। অনুরূপ চরণ হচ্ছে তৃতীয়টি। দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণেও অন্ত্যমিল আছে। এই মিলই প্রধান।

আলোচনা ।। কবিতাটিতে বহু নতুন শব্দ আছে। শব্দগুলির ব্যবহার ও অর্থ শিখে নেবে। লক্ষ্য কর, আয়ুকে শৈবালের ডগায় ঝুলে থাকা শিশির কণার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে আবার সংসারকে তুলনা করা হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে। আয়ুও যখন কম, সংসারও যখন যুদ্ধক্ষেত্র, তখন কীর্ত্তিমান হবার পথ কি ? অতীত কথা ভেবেও কাল কাটিও না, ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেও উল্লাস বোধ করো না। সময়ের সার হচ্ছে 'বর্ত্তমান'–একে যোগ্য ভাবে ব্যবহার কর।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন [প্রতিটি দশ নম্বর]

১। কবি 'সংকল্প-সাধন' কবিতার সময় সম্পর্কে কি মত প্রকাশ করিয়াছেন ? সংসারকে কবি কিসের সহিত তুলনা করিয়াছেন ? জগতে দুর্লভ বস্তু কি ?

[৩+৩+৪]

২। 'সাধিতে আপন ব্রত' কথাটির অর্থ বল ? সংকল্প সাধনের পদ্ধতি কি ? অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কি বলিয়া কবি আমাদের সতর্ক করিয়াছেন ?

[৪+৩+৩]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন [প্রতিটি তিন নম্বর]

১। "ভয়ে ভীত হয়ো না মানব।"–মানব কিসে ভয় পাইবে না ? ভয় না পাইলে কি হইবে ?

[১+২]

২। "মনোহর মূর্তি হেরে।"–কথাটির গদ্যরূপ লিখ। মনোহর-মূর্তি কাহার ?

[১+২]

৩। "পুনঃ আর ডেকে এনে"–কাহাকে ডাকিয়া আনার কথা বলা হইয়াছে ? কেন 'পুনঃ' ডাকা হইবে ?

[১+২]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন [প্রতিটি আট নম্বর]

১। "সহায় সম্পদ বল––শৈবালের নীর।"–'কাল' কি ? সকল কিছু ঘুচাইবার শক্তি তাহার কিরূপে হইল ? 'শৈবালের নীরের' সহিত আয়ুর তুলনা দেওয়া হইল কেন ?

[২+২+২+২]

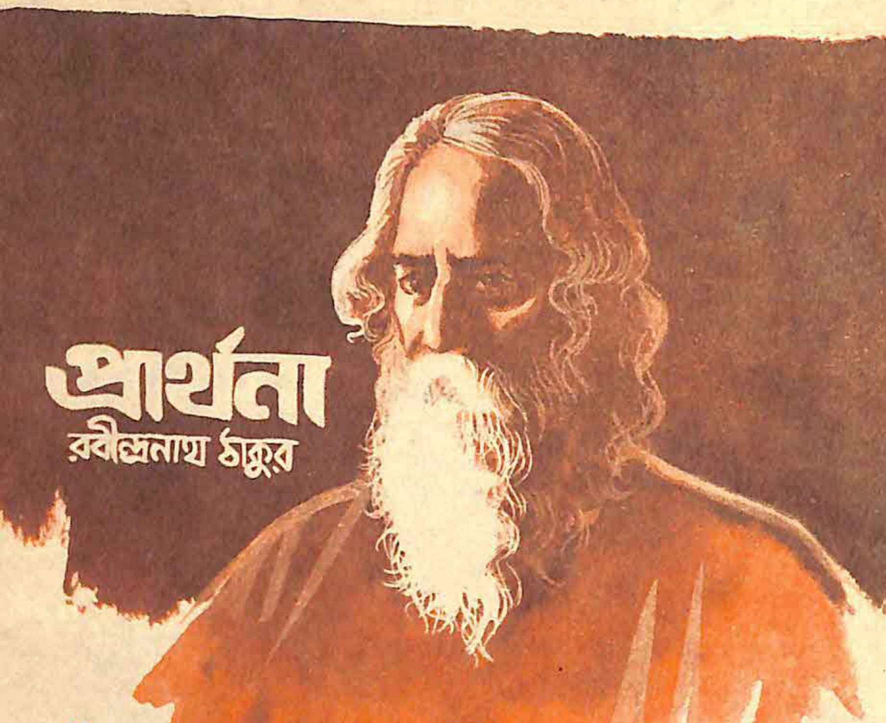
২। "সংসার সমরাঙ্গনে––মহিমাই জগতে দুর্লভ।"
কাহার রচিত কোন্ কবিতা হইতে উপরের অংশটি গৃহীত ? এখানে সংসারকে সমরাঙ্গন বলা হইয়াছে কেন ? 'মহিমা' বলিতে কবি কি বুঝাইয়াছেন ? ইহা জগতে দুর্লভ কেন ?

[২+২+২+২]

৩। "সাধিত আপন ব্রত––সময়ের সার বর্তমান"–আপন ব্রত সাধনের পথ কি ?

প্রার্থনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বিষয় পরিচিতি : গীতাঞ্জলির কয়েকটি কবিতা ইংরাজীতে অনুবাদ করে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পান। কবির ঈশ্বরভক্তির নতুন সুর সারা বিশ্বকে বিমুগ্ধ করেছিল। সে সুর কেমন ? আলোচ্য কবিতায় তোমরা তার খানিকটা পরিচয় পাবে।

বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ-তাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা
দুঃখে যেন করিতে পারি জয় ।।
সহায় মোর না যদি জুটে নিজের বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।

আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ নহে মোর প্রার্থনা,
তরিতে পারি শকতি যেন রয় ।।
আমার ভার লাঘব করি নাইবা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয়।
নম্র শিরে সুখের দিনে তোমারি মুখ লইব চিনে,
দুঃখের রাতে নিখিল ধরা যেদিন করে বঞ্চনা,
তোমার যেন না করি সংশয় ।।

ধার করে।। মানব-দেবতার কাছে তাঁর প্রার্থনা বিপদে যেন তিনি তাঁর কাছে কোন সাহায্য প্রার্থনা না করেন, বিপদে, দুঃখে তিনি যেন আত্মশক্তিতে দৃঢ় হতে পারেন। সংসারে প্রতি পদে ক্ষতি হলে, বঞ্চনা হলেও তিনি যেন নিজেকে দৃঢ় রেখে সহ্য করার শক্তি অর্জন করেন।

।। পাঠ সহায়িকা ।।

বিষয় উৎস : এই কবিতাটি গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের চতুর্থ কবিতা। প্রসঙ্গত মনে রাখ, গীতাঞ্জলির প্রথম কবিতার প্রথম পংক্তি হচ্ছে 'মোর মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ-ধূলার তলে।'

আলোচনা : এখানে প্রার্থনার অবিভনবত্ব লক্ষ্য কর। কবি বিপদে বিচলিত নন। ঈশ্বর তাঁকে নাবালকের মত রক্ষা করুন, তা চান না। তিনি বলেন, তিনি যেন বিপদে বিচলিত না হয়ে নিজেই নিজেকে রক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন। তিনি দুঃখে সান্ত্বনা চান না, চান দুঃখকে জয় করবার দুর্জয় শক্তি। তিনি বিপদের মধ্যে ঈশ্বরে সন্দেহ প্রকাশ করতে চান না। সর্ব বিড়ম্বনাতেও যেন তাঁর ঈশ্বর ভক্তি থাকে অবিচল। আসলে কবি এক বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় দৃঢ় মনুষ্যত্ব কামনা করেন।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন [প্রতিটি দশ নম্বর]

১। ভগবানের কাছে কবি কি কি প্রার্থনা করিয়াছেন ? তাঁহার প্রার্থনার বৈশিষ্ট্য কি ? [৭+৩]

২। কবি ঈশ্বরের নিকট সাহায্য না চাহিয়া কি চাহিয়াছেন ? তাঁহার এইরূপ প্রার্থনার কারণ কি ? সাধারণ লোকের প্রার্থনার সহিত এই প্রার্থনার তফাত কি ? [৩+৩+৪]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন [প্রতিটি তিন নম্বর]

১। "নাই বা দিলে সান্ত্বনা।"–সান্ত্বনা না দিলে কি দিবেন ? কবির সান্ত্বনা চাহিবার কারণ কি ? [১+২]

২। "নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।"–নিজের মনে ক্ষয় মানা অর্থ কি ? ইহা না মানারই বা কারণ কি ? [১+২]

৩। "যে দিন করে বঞ্চনা"–কোন্ দিন, কে কাহাকে কিরূপে বঞ্চনা করে ? [১+২]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন [প্রতিটি আট নম্বর]

১। বিপদে মোরে.....না যেন করি ভয়।

সাধারণ লোকের প্রার্থনা কি থাকে ? কবি ইহার পরিবর্তে কি প্রার্থনা করিয়াছেন ? কবির এই প্রার্থনা কেন ? ইহার দ্বারা কি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়িয়াছে ? [২+২+২+২]

২। নম্র শিরে সুখের দিনে....না করি সংশয়।

সুখের দিনে সাধারণ মানুষ কি করে ? কবি কি করিতে চাহেন ? কেন ? দুঃখের রাতে কি হয় ? নিখিল-ধরা বঞ্চনা করে, এ কথার অর্থ কি ? তোমারে সংশয় অর্থ কি ? [১+১+১+১+২+২]



নগরলক্ষ্মী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিষয় পরিচিতি : এটি একটি কাহিনীমূলক কবিতা। এই কবিতায় একটি শিক্ষণীয় বক্তব্যও আছে। যা একের পক্ষে সম্ভব নয়, তা বহুজনের সহায়তায় সম্ভব। শ্রাবস্তীপুরের দুর্ভিক্ষ একা রত্নাকর শেঠ, সামন্ত জয়সেন বা ধর্মপাল দূর করতে পারেন নি। কিন্তু দীনা মেয়ে সুপ্রিয়া দূর করবার দায়িত্ব নিয়েছে। কিভাবে ? শেষ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে এ প্রশ্নের উত্তর।

দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে
জাগিয়া উঠিল হাহারবে
বুদ্ধ নিজ ভক্তগণে, শুধালেন জনে জনে,
'ক্ষুধিতেরে অন্নদান-সেবা
তোমরা লইবে বল কেবা ?'

শুনি তাহা রত্নাকর শেঠ
করিয়া রহিল মাথা হেঁট।
কহিল সে কর জুড়ি, 'ক্ষুধার্ত বিশাল পুরী,
এর ক্ষুধা মিটাইব আমি–
এমন ক্ষমতা নাই স্বামী।'

কহিল সামন্ত জয়সেন,
'যে আদেশ প্রভু করিছেন
তাহা লইতাম শিরে যদি মোর বুক চিরে
রক্ত দিলে হ'ত কোন কাজ–
মোর ঘরে অন্ন কোথা আজ!

নিঃশ্বাসিয়া কহে ধর্মপাল,
'কি কব, এমন দগ্ধ ভাল–
আমার সোনার খেত শুষিছে অজন্মা-প্রেত
রাজকর জোগানো কঠিন।
হয়েছি অক্ষম দীনহীন।'

রহে সবে মুখে মুখে চাহি,
কাহারো উত্তর কিছু নাহি।
নির্বাক সে সভাঘরে ব্যথিত নগরী-'পরে
বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি,
সন্ধ্যাতারা সম রহে ফুটি।

তখন উঠিল ধীরে ধীরে
রক্তভাল লাজনম্র শিরে
অনাথপিন্ডদ সুতা, বেদনায় অশ্রুপ্লুতা
বুদ্ধের চরণরেণু লয়ে
মধুকন্ঠে কহিল বিনয়ে–

'ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়া,
তব আজ্ঞা লইল বহিয়া।
কাঁদে যারা খাদ্যহারা আমার সন্তান তারা,
নগরীরে অন্ন বিলাবার
আমি আজ লইলাম ভার।'

বিস্ময় মানিল সবে শুনি–
'ভিক্ষুকন্যা তুমি যে ভিক্ষুণী,
কোন্ অহংকারে মাতি লইলে মস্তক পাতি
এ-হেন কঠিন গুরু কাজ ?
কী আছে তোমার কহো আজ।

কহিল সে নমি সবা-কাছে,
'শুধু এই ভিক্ষাপাত্র আছে।
আমি দীনহীন মেয়ে অক্ষম সবার চেয়ে,
তাই তোমাদের পাব দয়া–
প্রভু-আজ্ঞা হইবে বিজয়া।

'আমার ভান্ডার আছে ভ'রে
তোমা-সবাকার ঘরে ঘরে।
তোমরা চাহিলে সবে এ পাত্র অক্ষয় হবে,
ভিক্ষা-অন্নে বাঁচাব বসুধা–
মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।'

।। পাঠ সহায়িকা ।।

উৎস : রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী' কাব্যগ্রন্থের 'কথা' অংশ থেকে এই কবিতাটি গ্রহণ করা হয়েছে। কবি এই গল্পটি গ্রহণ করেছেন 'কল্ম দ্রুমাবদান' নামক বৌদ্ধ শাস্ত্র থেকে।

আলোচনা : এই গল্পের বর্ণনার নাটকীয়তা লক্ষ করবে। শ্রাবস্তীপুরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। বুদ্ধদেব তাঁর ভক্তদের ডেকে বললেন ক্ষুধিতকে অন্নদানের ব্রত কে গ্রহণ করবে ? সকলেই মাথা হেঁট করে রইলেন। তবে কি পূর্ণ হবে না বুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা ?

এই নাটকীয় মুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়ে দায়িত্ব নিয়েছে ভিক্ষুণী সুপ্রিয়া। কিন্তু সেই বা এতবড় দায়িত্ব পালন করবে কি ভাবে ? কি আছে তার ?

আছে তার ভিক্ষাপাত্র। সকলের ভিক্ষায় সে দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। ভিক্ষাব্রতের মহত্ব প্রতিষ্ঠিত হল এখানে।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

[প্রতিটি দশ নম্বর]

১। 'নগরলক্ষ্মী' কবিতায় কোথায় দুর্ভিক্ষ শুরু হয় ? বুদ্ধদেব নিজ ভক্তদের তখন কি দায়িত্ব গ্রহণের কথা বলেন ? কে কে সেই দায়িত্ব প্রত্যাখ্যান করেন ? অবশেষে কে সেই দায়িত্ব গ্রহণ করিল ?

[১+২+৩+৪]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন [প্রতিটি তিন নম্বর]

১। "কহিলেন সামন্ত জয়সেন"–তিনি কি কহিলেন ?

[৩]

২। "আমার সন্তান তারা"–কে কাহার সন্তান ? সন্তানদের জন্য তিনি কি করিলেন ?

[১+২]

৩। "কি আছে তোমার কহো আজ।"–এ কথা কে কাহাকে বলেন ? এ কথা বলিবার কারণ কি ?

[১+২]

৪। "এ পাত্র অক্ষয় হবে।"–কোন্ পাত্র ? তাহা অক্ষয় হইবার উপায় কি ?

[১+২]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন [প্রতিটি আট নম্বর]

১। "বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি.....সন্ধ্যাতারা সম রহে ফুটি।"–বুদ্ধের আঁখি দুটি করুণ কেন ?....তাহাকে সন্ধ্যাতারার সহিত তুলনা করা হইয়াছে কেন ? বর্তমান প্রসঙ্গে এইরূপ বলার কোন্ বিশেষ অর্থ আছে ?

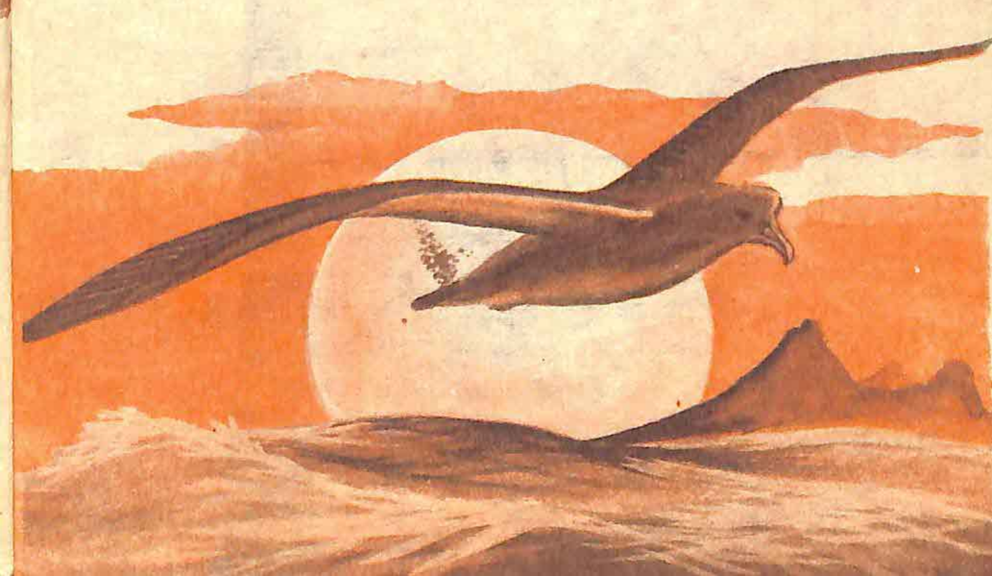
[৩+৩+২]

২। "কাঁদে যারা খাদ্যহারা আমার সন্তান তারা।"
কাহারা কাঁদের ? কেন কাঁদে ? একথা কে বলিয়াছেন ? খাদ্যহারাদের সন্তান ভাবিবার কারণ কি ?

[৩+১+২+২]

৩। "আমার ভান্ডার আছে.....সবাকার ঘরে ঘরে।"
আলোচ্য অংশটি কোন্ কবির লেখা কোন্ কবিতা হইতে লওয়া হইয়াছে ? কোন্ প্রসঙ্গে কে এই কথা বলিয়াছেন ? 'আমার ভান্ডার আছে....সবাকার ঘরে ঘরে।'–উদ্ধৃতিটির অর্থ পরিস্ফুটিত কর।

[২+২+৪]



গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বিষয় পরিচিতি : এই কবিতায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ মূলতঃ অবিভক্ত বঙ্গদেশে রূপ ও ঐশ্বর্য বর্ণনা করছেন। দেশকে তিনি সজীব মাতৃরূপে কল্পনা করেছেন। গঙ্গানদী যেন মায়ের হৃদয়। এই জন্যই কবিতার নাম গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি। গঙ্গা পবিত্র–বঙ্গভূমির হৃদয়ও পবিত্র।

ধ্যানে তোমার রূপ দেখি গো স্বপ্নে তোমার চরণ চুমি,
মূর্ত্তিমন্ত মায়ের স্নেহ! গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি!
তুমি জগৎ-ধাত্রীরূপা পালন কর পীযূষ দানে,
মমতা তোর মেদুর হ'ল, মধুর হল নবীন ধানে।



সাগরে তোর শঙ্খ বাজে—শুনতে যে পাই রাত্রি-দিবা,
হিমাচলের তুষার চিরে চক্র তোমার চলছে কিবা!
দেখছি গো রাজরাজেশ্বরী মূর্তি তোমার প্রাণের মাঝে,
বিদ্যুতে তোর খড়্গ জ্বলে বজ্রে তোমর ডঙ্কা বাজে।

অন্নদা তুই অন্ন দিতে পিছ-পা নহিস্ বৈরীকে তা
গৌরী তুমি-তৈরী তুমি গিরিরাজের গৈরীকে।
চন্দনে তোর অঙ্গ পরশ, হরষ নদী-কল্লোলে,
শ্রাবণ-মেঘে পবন-বেগে তোমার কালো কেশ দোলে।

নাগ-কেশরে চামর করে, কোয়েল তোষে সঙ্গীতে,
অভিষেকের বারি ঝরে নিত্য চেরাপুঞ্জিতে।
তোমার চেলী বুনবে ব'লে প্রজাপতি হয় তাঁতী,
বিনি-পশুর পশম তোমার যোগায় কাপাস দিন রাতি।
ভান্ডারে তোর নেইকো চাবি, বাইরে সোনা তোর যত,—
মাটিতে তোর সোনা ফলে কে আছে বল তোর মত?
তোর সোনা সুবর্ণরেখায় রেখায় রেখায় থিতিয়ে রয়,
ছুটবে কে পারস্য সাগর? মুক্তা সে তোর ঝিলেই হয়।

ঝিলে তোমার মুক্তা ফলে জলায় ফুলের জলসা রোজ,
তোমার বিলে মাছরাঙা আর মাণিক-জোড়ের নিত্য ভোজ।
তুষের ভিতর পীযুষ তোমার তোমার জমছে দানা বাঁধছে গো,
গাছের আগায় জল-রুটি তোর পথিকজনে সাধছে গো!

গঙ্গাহৃদি—বঙ্গ-মুখো ফৌজ আলেকজান্দারী,
ঘর-মুখো যে কেন হঠাৎ কে না জানে মূল তারি।
তখনো যে কেউ ভোলে নি সিংহবাহুর বল,
তখনো যে কীর্তি খ্যাতি জাগছে তোমার আসিংহল।

তখন যে তুই সবল স্ববশ, স্বাধীন এখন স্বতন্ত্র,
সাম্রাজ্যেরই স্বর্গ-সিঁড়ি গড়ছ তখন অতন্দ্র!
ধ্যানে তোমার সে রূপ দেখি গঙ্গাহৃদি বঙ্গদেশ,
তিতি আনন্দাশ্রু-জলে, ক্ষণেক ভুলি সকল ক্লেশ।

মূলভাব॥ এই কবিতায় বঙ্গদেশের সৌন্দর্য বর্ণনা করা হয়েছে, বঙ্গদেশের ঐশ্বর্যের পরিচয়ও কবি দিয়েছেন। নদীমাতৃক বঙ্গদেশে গঙ্গানদী প্রবাহিনী, গঙ্গার মাহাত্ম্য অতীব। প্রাচীনকালে গঙ্গা-বিধৌত বঙ্গভূমি ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের শীর্ষে উন্নীত হয়েছিল। কবি সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, ঐশ্বর্যে প্রাচুর্যে উন্নমিত বঙ্গভূমির স্বপ্ন দেখেছেন।

।। পাঠ সহায়িকা ।।

উৎস : আমরা এ কবিতাটি 'কাব্য-সঞ্চয়ন' থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে সংগ্রহ করেছি। মূল কবিতা সুদীর্ঘ।

আলোচনা : কবির কল্পনা কি বিচিত্র পথে চলেছে তা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবে। মাতৃভূমিকে কবি অপরূপা, দয়াময়ী, ঐশ্বর্যময়ী এবং অনন্যারূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তাই এদেশের ভাল মন্দ সব কিছুই তাঁর কাছে সুন্দর ও মহৎ হয়ে উঠেছে। যেকালে এ কবিতা লেখা হয়েছে সেকালে স্বদেশবাসীদের মনে স্বদেশ ভক্তি এবং স্বাজাত্যবোধ জাগিয়ে তুলবার জন্য এ জাতীয় কবিতার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। বঙ্গভূমিকে কবি কেন গঙ্গাহৃদি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ? মায়ের রাণীর মত যে রূপ কবি আঁকিয়াছেন তাহা বর্ণনা কর ? কবি কেন বলিয়াছেন যে, মায়ের ভান্ডারে চাবি থাকে না ? [৩+৪+৩]

২। বঙ্গভূমিকে কোথাও অন্নদা, কোথাও গঙ্গাহৃদি বলিয়াছেন কেন ? কবি আলেকজান্দার ও বিজয় সিংহের কথা কেন বলিয়াছেন ? [৫+৫]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। "দেখছি গো রাজরাজেশ্বরী মূর্তি তোমার প্রাণের মাঝে।"–এই রাজরাজেশ্বরী মূর্তিটির বর্ণনা দাও। [৩]

২। কবি, প্রজাপতি ও কার্পাসকে কিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ? [৩]

৩। গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি কবিতায় কবি ধান ও নারিকেলকে কি রূপে বর্ণনা করিয়াছেন ? [৩]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১। "অন্নদা তুই অন্ন দিতে পিছ পা না হস বৈরীকে"–আলোচ্য অংশটি কোন্ কবির কোন কবিতা হইতে গৃহীত ? কোন্ প্রসঙ্গে এই কথা বলা হইয়াছে ? অন্নদা কে ? এখানে কাহাকে অন্নদা বলা হইয়াছে ? বৈরীকে দিতে পিছ পা নয়–এ কথা বলার তাৎপর্য কি ? [২+২+২+২+২]

২। "তুষার মাঝে পীযূষ তোমার......সাধছে গো।"

পীযূষ জমে দানা বাঁধা কি ? গাছের আগার জল-রুটিই বা কাহাকে বলা হইয়াছে ? এই কথাগুলির ভিতর দিয়া কবি বঙ্গভূমির কি বিশেষ পরিচয় বুঝাইতেছেন ? [২+২+২+২]

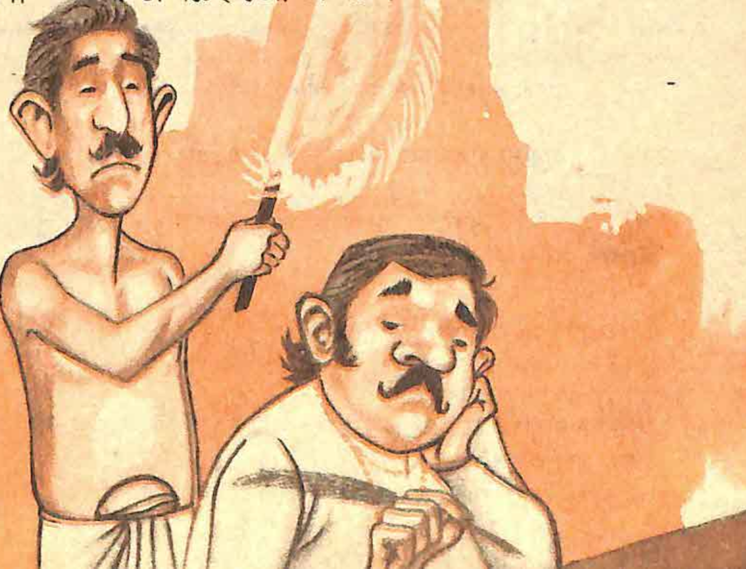
হতে পার্তাম

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বিষয় পরিচিতি : এটি দ্বিজেন্দ্রলালের একটি বিখ্যাত গান। হাসির গান লিখে দ্বিজেন্দ্রলাল খ্যাত ছিলেন। এখানে এক অকর্মন্য জমিদার, যাকে রাজা বলা হয়েছে, তার আর পারিষদের কথোপকথনের ছলে রাজার হাস্যকর চরিত্রটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ গানটি তাঁর ত্র্যহস্পর্শ নামক প্রহসনের প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে।

রাজা।। দেখ, হতে পার্তাম নিশ্চয় আমি মস্ত একটা বীর–
কিন্তু গোলাগুলির গোলে কেমন মাথা রয় না স্থির;
আর সঙ্গীন্ খাড়া দেখলেই মনে লাগে একটা ধন্দ;
খোলা তরোয়াল দেখলেই ঠেকে যেন শিরোহীন এ স্কন্ধ;
তাই বাক্যে বীরই হয়ে রৈলাম আমি-চটে' ম'টেই তো–
তা-নইলে খুব এক বড়ো —
পারিষদবর্গ।। হাঁ ,তা বটেই তো, তা বটেই তো।

রাজা।। দেখ, হতে পার্তাম নিশ্চয় একজন উঁচুদরের কবি–
কিন্তু লিখতে বসলেই অক্ষরগুলো গরমিল হয় যে সবই;
আর ভাষাটাও, তা ছাড়া, মোটেই বেঁকে না, রয় খাড়া;
আর ভাবের মাথায় লাঠি মার্লেও দেয় নাক' সে সাড়া;
ছাই হাজারই পা দুলাই, গোঁফে হাজারই দেই চাড়া;
তাই নীরব কবি হ'য়ে রৈলাম আমি চটে ম'টেই ত —
তা নইলে খুব একটা উঁচু —
পারিষদবর্গ।। হাঁ, তা বটেই তো, তা বটেই তো।



রাজা ।। দেখ, ক্ষমতাটা ছিলনাক' সামান্য বিশেষ ;
কেবল প্রথম একটা ধাক্কা পেলেই চলে যেতাম বেশ ;
হতাম পেলে সুযোগ বুঝি একটা যেও সেও,
ওই কেষ্ট-বিষ্টুর মধ্যে একটা হ'তাম নিঃসন্দেহ ;
কিন্তু প্রথম সে ধাক্কাটি আমায় দিলে নাকো কেহ ;
তাই যা ছিলাম তাই র'য়ে গেলাম আমি চটে ম'টেইতো ; —
তা নইলে—বুঝলে কিনা, —
পারিষদবর্গ ।। হাঁ, তা বটেই তো, তা বটেই তো।

।। আলোচনা ।।

হাস্যরসের মূলে অসংগতি। ছেলেমানুষ পড়ে গেলে আমাদের হাসি পায় না—বুড়ো মানুষ পড়লে পায়। কারণ বুড়ো মানুষের পড়াটা অসংগত। এখানেও অসংগত ঐ জমিদারবাবুর তথা রাজামশাই-এর দম্ভ। যিনি সারাজীবনে কিছুই হলেন না করলেনও না কিছুই, তাঁর এ দম্ভ হাস্যকর।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

[প্রতিটি আট নম্বর]

১। মস্ত একটা বীর হবার পক্ষে রাজার বাধা কোথায় কোথায় ? অবশেষে তিনি কি হয়ে রইলেন ? [৬+২]

২। "দেখ, হতে পার্তাম নিশ্চয় একজন উঁচুদরের কবি"—বক্তা কে ? কাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে ? বক্তা শেষ পর্যন্ত উঁচুদরের কবি হতে পেরেছিলেন কি ? কারণ দর্শাও। [২+২+২+২]

।। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ।।

[প্রতিটি তিন নম্বর]

১। যোদ্ধা না হয়ে রাজা কি হলেন ? কেন ? [১+২]

২। কবি না হয়ে রাজা কি হলেন ? এই হওয়ার সার্থকতা কি ? [১+২]

৩। প্রতিভা বিকাশের প্রধান অন্তরায় হিসাবে রাজা কোন্ সুযোগের অভাবকে উল্লেখ করেন ? [৩]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

[প্রতিটি আট নম্বর]

১। সপ্রসংগ ব্যাখ্যা লিখ :
'তাই নীরব কবি হ'য়ে রৈলাম আমি চটে মোটেই ত'। কেবল প্রথম একটা ধাক্কা পেলেই চ'লে যেতাশ বেশ।'
কবিতাটি কার লেখা ? কে চটে ছিলেন ? সত্যিই কি তিনি কবি হতে পারতেন ?
[২+২+৪]

জীবনসূর্য

কাজী নজরুল ইসলাম



বিষয় পরিচিতি : সূর্য সারা পৃথিবীর কাম্য বস্তু। সূর্য উঠলে ফুল ফোটে, সূর্য ডুবলে পৃথিবী অন্ধকার। কবি এই কবিতায় জীবনকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করে, সূর্যের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন যে, তোমরাও সূর্যের মত হয়ে ওঠ। তোমার আবির্ভাবে সবাই যেন হাসে, তোমার তিরোধানে সবাই যেন কাঁদে।

ভোরের বেলায় পুব গগনে সূয্যি ঠাকুর দেন উঁকি,
বলেন, 'অলস জড়ের মতন বসে বসে ভাবছ কী?
আমার আকাশ মায়ের কোলে জাগি আমি ভোরবেলায়,
আমার হাসির উচ্ছলতা বনে বনে ফুল ফোটায়।

ক্রমেই যত ঊর্ধ্বে উঠি ততই আমি হই প্রখর,
শক্তি তেজের উজল দ্যুতি ছড়াই বিশ্বভুবন 'পর।
রঙে রঙে রাঙাই আকাশ, যখন সাঁঝে অস্ত যাই,
ত্রিলোক মলিন মোর বিদায়ে, যাবার বেলা দেখতে পাই।।

তোমার জীবন এম্‌নি হবে, শৈশবে আনন্দময়,
যেথায় যাবে সেথায় যেন নূতন প্রাণের লহর বয়।
তোমার শক্তি তপস্যাতে আসবে কাছে ঊর্ধ্বলোক,
তোমার আলোক ঘুচিয়ে দেবে ত্রিজগতের দুঃখশোক।

এই পৃথিবীর আঁধার যত, এই মানুষের সকল ভয়,
করবে মোচন শক্তি দিয়ে, শৌর্য দিয়ে হে দুর্জয়!
দশের–জাতির লজ্জা গ্লানি, কলঙ্ক ও অসম্মান,
তোমার তেজে দগ্ধ হবে, জাগবে বুকে নূতন প্রাণ।

যে সব আত্ম-অবিশ্বাসী ভয়ের গুহায় লুকিয়ে রয়,
তোমার ডাকে আসবে ছুটে হে তেজোবীর, হে দুর্জয়!
যে আদর্শ মানুষ আজও জন্মেনিকো এই ধরায়,
তুমিই হবে সেই সে মানুষ অধ্যবসায়, তপস্যায়।

সূর্যসম শেষ জীবনে রাঙিয়ে যাবে দিগ্বিদিক,
যুক্তকরে বিশ্বনিখিল গাইবে তোমার মাঙ্গলিক।
অস্ত গেলে রবি যেমন জগৎ দেখ অন্ধকার,
হারিয়ে তোমায় কাঁদবে শোকে তেমনি মানুষ এই ধরায়।।

।। আলোচনা ।।

কবিতাটি পড়ে তোমাদের ভাল লেগেছে জানি। এত সহজ সরল ভাষায় কবিতাটি লেখা যে বুঝতেও অসুবিধা হয় না। কবি কিন্তু আসলে তোমাদের উপদেশ দিয়েছেন। তোমরা নিজেরাও হয়ে ওঠ সূর্যের মত। সূর্য উঠলে যেমন ফুল ফোটে, তোমার উপস্থিতিতেও যেন তেমনি সকলে হাসে। যৌবনে তোমার দীপ্তিতে সকলে যেন ঝলসে যায়। কি ভাবে? তৃতীয় চতুর্থ স্তবকে তারই বর্ণনা। অবশেষে তোমার মৃত্যুর পরও যেন সূর্যের মতই সকলে চায় তোমার মত আর এক সূর্যের আবির্ভাব।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

[প্রতিটি দশ নম্বর]

১। সূর্য শিশুকে কি কি বলেন? কিরূপে কবি জীবনকে সূর্যের সহিত মিলাইয়া বর্ণনা করিয়াছেন?

[২+৮]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন [প্রতিটি তিন নম্বর]

১। "ত্রিলোক মলিন মোর বিদায়ে যাবার বেলা দেখতে পাই"—কাহার বিদায়ে ত্রিলোক মলিন হয় ? কেন ?

[১+২]

২। "তোমার তেজে দগ্ধ হবে"—কাহার তেজে ? কি দগ্ধ হবে ?

[২+১]

৩। "হারিয়ে তোমায় কাঁদবে শোকে"—কে হারাবে ? হারাবার অর্থ কি ? শোক হবে কেন ?

[১+১+১]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন [প্রতিটি আট নম্বর]

১। "আমার হাসির উচ্ছলতা বনে বনে ফুল ফোটায়।"
কবিতাটি কোন্ কবির লেখা কোন্ কবিতার অন্তর্গত ? কোন্ প্রসঙ্গে এই কথা বলা হইয়াছে ? "আমার হাসির উচ্ছলতা বনে বনে ফুল ফোটায়" কথাটির অর্থ কি ?

[২+২+২]

২। "যে সব আত্ম-অবিশ্বাসী......হে দুর্জয়।"
কবি আত্ম-অবিশ্বাসী বলিতে কাহাকে বুঝাইতেছেন ? ভয়ে গুহায় মুখ লুকানোর তাৎপর্য কি ? তোমার ডাক তাহাদের কিরূপে ছুটিতে বাধ্য করিবে.?

[২+২+২]

উত্তর।। সূর্যের কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নীরবে যার তোমার কথা বলা হয়েছে, সূর্যের উপস্থিতিতে রাত-প্রভাতে যেমন আলোর সাড়া পড়ে যায়, সমস্ত সৃষ্টি যেমন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তেমনি মানুষেরও সেই রকম হওয়া উচিত। প্রতিদিন রাতের আমাদের উপস্থিতিতে, আবির্ভাবে যেন চারদিকে আনন্দের সাড়া পড়ে। সূর্যের মত ও যেন সূর্যের অনুপস্থিতিতে সূর্যের আসনে, অন্ধকারের আসনে মানুষ ভারাক্রান্ত হয়, তেমনি আমাদের বেলাও যেন সবাই স্মরণ করে।

S.C.E.R.T., West Bengal
Date........ 14/1/92
Acc. No.... 5120

S.C.E.R.T., West Bengal
Library
Calcutta
25/3, B. C. Road

লোকলজ্জা

কামিনী রায়

বিষয় পরিচিতি : অকারণ লোক-লজ্জা কি মারাত্মক ব্যাপার – এই কবিতায় কবি তাই বর্ণনা করেছেন। কবি যখন এ কবিতা রচনা করেন, তখন দেশ ছিল পরাধীন – সে সময়ে এমন চিন্তা আরও প্রকট ছিল স্বাধীনতার পর বোধ খানিকটা কমলেও, আজও নির্মূল হয় নি। তোমরা 'লোকে কি বলবে' এই ভয়ে সত্য থেকে সরে এসো না – যদি লোক-লজ্জাকে জয় করতে পার, তবেই কবিতাটি পাঠ সার্থক হবে।

করিতে পারি না কাজ, সদা ভয় সদা লাজ,
সংশয়ে সঙ্কল্প সদা টলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।

আড়ালে আড়ালে থাকি, নীরবে আপনা ঢাকি,
সম্মুখে চরণ নাহি চলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।



হৃদয়ে বুদ্‌বুদ্ মত, উঠে শুভ্র চিন্তা কত,
মিশে যায় হৃদয়ের তলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।

কাঁদে প্রাণ যবে আঁখি সযতনে শুষ্ক রাখি,
নিরমল নয়নের জলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।

একটি স্নেহের কথা, প্রশমিতে পারে ব্যথা,
চলে যাই উপেক্ষার ছলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।

মহৎ উদ্দেশ্যে যবে, এক সাথে মিলে সবে,
পরি না মিলিতে সেই দলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।

বিধাতা দেছেন প্রাণ, থাকি সদা ম্রিয়মাণ,
শক্তি মরে ভীতির কবলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।

আলোচনা

সর্বপ্রকার ভয়ই পরিত্যাগ করা উচিত। সবচেয়ে বড় ভয় লোকলজ্জা। লোকে কি বলবে, এই ভেবে আমরা কত কাজই করতে সাহস পাই না। তাই কবি ক্ষোভ করে বলেছেন 'শক্তি মরে ভীতির কবলে।' স্বদেশসেবার শক্তি, সত্য বলার শক্তি ইত্যাদি নিয়েও আমরা নীরবে নির্বিকার হয়ে থাকি। এতে ক্ষতি নিজের, ক্ষতি সমাজের, ক্ষতি দেশের। এ ক্ষতির হাত থেকে যদি নিজেকে, সমলজকে ও দশকে বাঁচাতে পার, তবে এ কবিতা পাঠ সার্থক হবে।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন [প্রতিটি দশ নম্বর]

১। লোকলজ্জা আমাদের কি কি কাজ করিতে দেয় না, এক এক করিয়া সেই গুলির নাম বল। এই প্রসঙ্গে "শক্তি মরে ভীতির কবলে"–কথাটির অর্থ বল? [৪+৬]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

[প্রতিটি তিন নম্বর]

১। "নীরবে আপনা ঢাকি।" আপনা ঢাকি কথাটির অর্থ কি ? কেন এমন ঢাকিতে হয় ?

[২+১]

২। "সযতনে শুষ্ক রাখি।"—কে, কি শুষ্ক রাখেন ? সযতনে কেন ?

[২+১]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

[প্রতিটি আট নম্বর]

১। "আড়ালে আড়ালে—পাছে লোকে কিছু বলে।"
কাহার রচিত কোন্ কবিতা হইতে অংশটি গ্রহণ করা হইয়াছে ? কি প্রসঙ্গে কবি একথা বলিয়াছেন ? আড়াল কি ? "আপনা ঢাকি" কথাটির তাৎপর্য কি ? "সম্মুখে চরণ চলা" কথাটির দ্বারা কি বুঝান হইয়াছে ? শেষ চরণের সহিত অন্য অংশের সম্পর্ক বুঝাইয়া বল।

[২+২+২+২]

২। ম্রিয়মাণ থাকার প্রসঙ্গে বিধাতা প্রাণ দিয়াছেন বলিবার অর্থ বুঝাইয়া দাও। "শক্তি মরে ভীতির কবলে"—কথাটির অর্থ বুঝাইয়া দাও। শেষ পংক্তির সহিত অন্য পংক্তির অন্তর্গত মিল কোথায় ?

[৩+২+৩]

উত্তর ।। [illegible]



চাষার খেদ

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত



বিষয় পরিচিতি : কিছুদিন আগেও ভাবা হ'ত জমি মাত্রেরই মালিক জমিদার। তিনিই দয়া করে চাষাকে জমি চষতে দিয়েছেন। অতএব প্রয়োজন মত জমিদারকে সেবা করা চাষার কর্তব্য–তাতে তার নিজের কাজের ক্ষতি হলেও। একেই বলা হ'ত বেগার দেওয়া।

এখানে বেগার প্রথা যে কি অমানবিক তা বোঝান হয়েছে এক চাষার উক্তিতে।

রাজার পাইক বেগার ধরেছে,
ক্ষেতে যাওয়া বন্ধ হ'ল আজ,
পরের কাজে কাটবে সারাদিন,
রইল পড়ে ঘরের যত কাজ।
আষাঢ় মাসে চাষের ক্ষেতে,
খাটছে সবে দিনে রেতে,
শেষ জোয়েতে রুইব বলে বেরিয়েছিলাম আজ,
হঠাৎ প'ল রাজার বাড়ী কাজ।

লোকের ক্ষেতে নতুন চারাগুলি,
সবুজ যেন টিয়াপাখীর পাখা।
পাটের ডগা লকলকিয়ে উঠে,
বালুর মাঠের বাজার দিল ঢাকা।
গাঙের জলও বানের টানে
আসল ধেয়ে গাঁয়ের পানে,
পল্লীপথ ঐ গোরুর ক্ষুরে আজকে কাদামাখা,
শস্যভারে পড়ল চড়া ঢাকা।

উপর–ঝরণ–দারুণ বাদলে
ভাসছে জলে জীর্ণ কুঁড়েখান,
মোড়লের ঝি ভাবছে অধোমুখে,
বাঁচবে কিসে ছেলে দুটির প্রাণ।
'শ্যামলা' মোর দুঃখ বুঝে
দাঁড়িয়ে ভেজে চক্ষু বুঁজে,
সুদের দায়ে দাদাঠাকুর গোয়ালে দেয় টান,
রুইতে পেলে হ'ত ক'বিশ ধান।

জীর্ণ চালে হ'ল না আর দেওয়া
কোথাও দুটি পচা খড়ের গুঁজি,
রাজার কাজে বেগার দিতে
লোক মিলিল না কি, এ গ্রামখানি খুঁজি ?
সারা সনের অন্ন ছাড়ি,
যেতেই হবে রাজার বাড়ী,
স্বর্ণ চূড়ার বর্ণ সেথায় মলিন হল বুঝি !
ঘুচবে ঘুচুক কাঙাল চাষীর রুজি ।।

।। আলোচনা ।।

একটি চাষী বেগার প্রথার শিকার হয়েছে। ফলে না পারবে সে তার নিজের জমির ধান কাটতে যেতে, না পারবে তার নিজের খড়ের চালে দু'টি গুছি খড় গুঁজে দিতে। তাকে যেতে হবে জমিদার বাড়ির ঝলমলে পালিশ রক্ষা করতে। এদিকে পরিবর্তে সে কি পাবে ? এ তো অর্থহীন বেগার। তাই জীবনে তার না আছে সহায় না সম্পদ। তার বাড়ির গরুটি পর্যন্ত এক আঁটি খড় পায় না। এ দুর্দশা থেকে ওরা কি মুক্তি পাবে না।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন [প্রতিটি দশ নম্বর]

১। 'চাষার খেদ' কবিতায় চাষা কোথায় যাইতেছিল ? তাহাকে কে ধরিল ? বেগার ধরা কি ? ইহার ফলে তাহার কি ক্ষতি হইবে ?

[২+২+২+৪]

২। 'চাষার খেদ'-এর কারণ কি ? এই খেদ করা কি চাষার উচিত ? কবিতাটির মধ্যে চাষার জীবনের যে বেদনার দিক ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা বর্ণনা কর।

৩। 'চাষার খেদ' – কবিতায় কোন্ কালের কথা বলা হইয়াছে ? সেই কালে চাষীরা প্রকৃতপক্ষে কেন ব্যস্ত থাকে ? এই কবিতা হইতে সেই কালের চাষের ক্ষেত, গাঙের জল ও পল্লীপথের বর্ণনা দাও।

[২+২+৪]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন [প্রতিটি তিন নম্বর]

১। 'মোড়লের ঝি কে ? সে কি ভাবিতেছে ?

২। দাদাঠাকুর কি কাজ করেন ? চাষা তাহার নিকট কিসের দায়ে বদ্ধ ? ইহার ফলে দাদাঠাকুর কি করিবেন ?

৩। 'শ্যামলা' বলিতে কাহাকে বুঝান হইয়াছে ? সে কি বুঝে ? বুঝিয়া [কি করে]?

[১+১+১]

৪। "গুঁজি"–কি ? চাষা কোথায় কিরূপে গুঁজি ব্যবহার করে ?

৫। "রুইতে গেলে হ'ত ক'বিশ ধান।"–রোয়া কি ? ক'বিশ ধান–বলিতে কি বোঝ ?

[১+২]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন [প্রতিটি আট নম্বর]

১। "সুদের দায়ে দাদাঠাকুর গোয়ালে দেয় টান।" আলোচ্য উদ্ধৃতিটি কোন্ কবিতার অন্তর্গত ? কবিতাটি কে লিখিয়াছেন ? দাদাঠাকুর বলিতে কোন্ কোন্ শ্রেণীর মানুষের কথা বলা হইয়াছে ? তাহারা চাষীর জীবনকে কিভাবে বিড়ম্বিত করে ? গোয়ালে দেয় টান কথাটির অর্থ বল।

[২+২+২+২]

২। "সারা সনের অন্ন ছাড়ি––কাংগাল চাষীর রুজি।" সারা সনের অন্ন বলিতে কি বুঝান হইয়াছে ? কেন রাজার বাড়ি যাইতেই হইবে ? স্বর্ণচূড়ার বর্ণ মলিন হওয়ার তাৎপর্য কি ? চাষীর রুজি ঘুচার তাৎপর্য কি ?

[২+২+২+২]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

১। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ:

সুদূর, দরিদ্র, অলৌকিক, আহার।

২। ভাষান্তরিত কর:

মন্দিরে আনন্দময়ী মাতার.... প্রত্যক্ষ দর্শন হইবে।



অপরূপ প্রতিশোধ

মৌলভী গোলাম মস্তাফা

বিষয় পরিচিতি : মুসলমান ধর্মের প্রবর্ত্তক ছিলেন প্রভু মোহম্মদ। মৃত্যুর আগে তিনি সকলের কাছে সকল ঋণে মুক্ত হতে চাইলেন। কারো প্রতি অজ্ঞাতে তিনি কোন অপরাধ করে থাকলে এখন সে তার প্রতিশোধ নিয়ে তাঁকে ঋণমুক্ত করুক।

কিন্তু মোহম্মদের ওপর কে প্রতিশোধ নেবে? আক্কাস বল্‌ল আমি নেব। কি প্রতিশোধ নিল সে? কবিতার বিষয়বস্তুতে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রভু মোহম্মদ মৃত্যু শয়নে কহিলেন সবে ডাকি,
'জীবন-সন্ধ্যা ঘনায়ে এসেছে, নাহি আর বেশী বাকী–
হে আমার প্রিয় ভক্তবৃন্দ, হে আমার সহচর,
করে থাকি যদি কোন অবিচার কোনদিন করো' পর–
করে থাকি যদি কিছু অপরাধ, কিছু অন্যায়, ক্রোধ–
সবার মাঝারে ইহলোকে আজি লও তার প্রতিশোধ।'

সমবেত জন সেকথা তাহার তুলিল না কেহ কানে,
কাহারো হৃদয়ে লাগেনি আঘাত একথা সবাই জানে।
হেনকালে সেথা আক্কাস্ উঠি' কহিলেন–নবীবর,
মেরেছিলে তুমি কোড়া একদিন অধমের দেহ'পর।'

প্রভু মোহম্মদ যুবকে তখনি পৃষ্ঠ দিলেন পাতি,
আমার পৃষ্ঠে বসন ছিল না' কহিল কপটমতি।
শুনিয়া সে কথা হজরত তবে মৃদু মধুর স্বরে,
'তাই হোক' বলি অংগাবরণ ফেলিয়া দিলেন দূরে।

সোনার সে তনু 'হেরি' আক্কাস পুলকে আত্মহারা,
মিটিল তাহার মনের বাসনা, ঝরিল নয়নে ধারা।
মাথা করি নত হজরত পানে হইয়াছে সে আগুয়ান,
প্রতিশোধ-রূপে পৃষ্ঠে তাঁহার চুম্বন করে দান।
গভীর পুলকে সবারি তখন কন্ঠ হইল রোধ,
হাসিমুখে নবী কহিলেন, 'এ যে অপরূপ প্রতিশোধ।'

।আলোচনা ।।

কবিতাটি খুবই নাটকীয় ভাবে রচিত। শেষ মুহূর্তে কাহিনীর মোড় ঘুরেছে। আক্কাস হঠাৎই চুম্বন করেছে মোহম্মদের পিঠে। আসলে ভালবাসা ভালবাসাকেই চেনে আগে। মোহম্মদের ভালবাসা ও মহত্ব আক্কাসকেও প্রেমী ও মহৎ করে তুলেছে।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন [প্রতিটি দশ নম্বর]

১। প্রভু মোহম্মদ তাঁহার শিষ্যদের ডাকিয়া কি বলিলেন ? তাহার উত্তরে সাধারণ শিষ্যরা কি করিলেন ? আক্কাস কি করিল ?

[৪+৩+৩]

২। "অপরূপ প্রতিশোধ" কবিতায়–কে কাহার উপর প্রতিশোধ লইল ? কেন প্রতিশোধ লইল ? প্রতিশোধকে অপরূপ বলা হইল কেন ?

[৩+৩+৪]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন [প্রতিটি তিন নম্বর]

১। "করে থাকি যদি কোন অবিচার কোনদিন কারো পর"–একথা কে কখন বলেন ?

[৩]

২। "আমার পৃষ্ঠে বসন ছিল না"–কাহার বসন ছিল না ? কখন একথা কেন বলেন ?

[১+২]

৩। "গভীর পুলকে সবারি তখন কন্ঠ হইল রোধ।"–সকলের কন্ঠ রোধ হইবার মত ঘটনাটি কি ?

[৩]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন [প্রতিটি আট নম্বর]

১। "করে থাকি যদি–লও তার প্রতিশোধ।"–ইহা কাহার উক্তি ? কোন্ কবিতার অংশ ইহা ? ইহার রচয়িতা কে ? তিনি কখন একথা বলেন ? একথা বলার তাৎপর্য কি ? ইহার ভিতর দিয়া বক্তার কোন্ মহত্ব প্রকাশিত হইয়াছে ?

[১+১+১+১+২+২]

২। "গভীর পুলক হইল"–কেন ? গভীর পুলকের সহিত কন্ঠরুদ্ধ হইবার সম্পর্ক কি ? নবী কে ? তাঁহাকে কেন নবী বলা হয় ? প্রতিশোধটা কি ? ইহাকে অপরূপ বলা হইল কেন ? ঘটনাটির মধ্যে কাহার মহত্ব কিরূপে বোঝা গেল ?

[১+১+১+১+১+১+২]

ব্যাখ্যা ॥ ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মোহম্মদ মৃত্যুশয্যায় সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যার কাছে তাঁর যা ঋণ আছে তা শোধ দিতে চাইলেন, [illegible] তখন [illegible] প্রভু একদিন আমাকে [illegible] মেরেছিলেন, মোহম্মদ তখন নিজের পিঠ পেতে দিলেন, [illegible] তখন [illegible] চুম্বন দিয়ে তাঁর প্রেমের নিবেদন জানালেন।

বাল্য-স্মৃতিতে রামমোহন

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর



বিষয় পরিচিতি : রাজা রামমোহন রায় ১৭৭২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ উপনিষদ্ থেকে এক-ঈশ্বরবাদ প্রচার করেন – তাঁর ধর্মের নাম হয় ব্রাহ্ম-ধর্ম। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরবর্তীকালে ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম নেতা হন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যকালে রামমোহনকে দেখেছেন, তাঁর স্নেহলাভ করেছেন। পরবর্তী জীবনে তিনি রামমোহনের প্রভাব বোধ করেছেন নিজের জীবনে। এখানে ছেলেবেলার সেই স্মৃতিকথা বর্ণনা করেছেন।

শৈশবকাল অবধি আমার রামমোহন রায়ের সহিত সংস্রব। আমি তাঁহার স্কুলে পড়িতাম। স্কুলটি হেদুয়ার পুষ্করিণীর ধারে প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজার পুত্র রমাপ্রসাদ আমার সংগে এক শ্রেণীতে পাঠ করিতেন। আমি প্রায় প্রতি শনিবার দুইটার সময় ছুটি হইলে রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত রামমোহন রায়ের মানিকতলার বাগানে যাইতাম। অন্য দিনও দেখা করিয়া আসিতাম। কোন কোন দিন আমি তথায় গিয়া বড়ই উপদ্রব করিতাম। বাগানের গাছের লিচু ছিঁড়িয়া, কখনো কলাইশুঁটি ভাঙিয়া মনের সুখে খাইতাম। রামমোহন রায় একদিন কহিলেন, "বেরাদর! রৌদ্রে হুটাপাটি করিয়া কেন বেড়াও, এইখানে বোসো, যত লিচু খেতে পার এখানে বসিয়া

খাও!" মালীকে বলিলেন, "যা, গাছ থেকে লিচু পেড়ে নিয়ে আয়।" সে তৎক্ষণাৎ এক থালা ভরিয়া লিচু আনিয়া দিল। তখন রামমোহন রায় বলিলেন, "যত ইচ্ছা লিচু খাও।"

"তাঁহার মূর্তি প্রশান্ত ও গম্ভীর। আমি বড় শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত তাঁহাকে দেখিতাম। বাগানে একটা কাঠের দোলা ছিল, রামমোহন রায় অংগ চালনার জন্য তাহাতে দোলা খাইতেন। আমি বৈকালে বাগানে গেলে তিনি আমাকে সেই দোলায় বসাইয়া আপনি টানিতেন; ক্ষণেক পরে আপনি তাহাতে বসিয়া বলিতেন, "বেরাদর, তুমি টান।"

রাজা আমাকে ভালবাসিতেন। আমার যখন ইচ্ছা রাজার নিকট যাইতে পারিতাম। একদিন প্রাতঃকালে আহারের সময় মধু দিয়া রুটি খাইতে খাইতে তিনি আমাকে বলিলেন, "বেরাদর, আমি মধু ও রুটি খাইতেছি, কিন্তু লোকে বলে আমি গোমাংস ভোজন করিয়া থাকি।" কোন কোন দিন রাজার স্নানের সময় তাঁহার বাটী যাইতাম। তাঁহার স্নান বড় চমৎকার ছিল। তিনি স্নানের পূর্বে সমস্ত শরীরে অধিক পরিমাণে সরিষার তৈল মর্দন করিতেন। তাঁহার শরীরে তৈল গড়াইয়া পড়িত। তিনি বলবান পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বক্ষস্থল প্রশস্ত ছিল। তাঁহার মাংসপেশীসমূহ শক্ত ছিল। তৈলমর্দিত অনাবৃত দেহ, কটিদেশের চতুষ্পার্শ্বে একখন্ড বস্ত্রমাত্র; তাঁহার এই প্রকান্ড মূর্তি দেখিয়া বালক বলিয়া আমার মনে ভীতিসঞ্চার হইত। এই প্রকার বস্ত্র পরিধান করিয়া বলপূর্বক পদনিক্ষেপ করিতে করিতে তিনি উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিতেন। সংস্কৃত, পার্শী ও আরবী ভাষায় কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে তিনি একটি প্রকান্ড জলপূর্ণ টবে ঝম্প প্রদান করিতেন। এই টবে তিনি এক ঘন্টার অধিক কাল থাকিতেন। এই সময়ে তিনি ক্রমাগত তাঁহার প্রিয় কবিতাসকল আবৃত্তি করিতেন।

রাজার এমন শক্তি ছিল যদ্দ্বারা তিনি সকল প্রকার লোককে আকর্ষণ করিতে পারিতেন। আমার উপর তাঁহার এক নিগূঢ় প্রভাব ছিল। আমি তখন বালক ছিলাম, সুতরাং তাঁহার সহিত কথোপকথনের সুযোগ ছিল না। কিন্তু আমার উপরে তাঁহার মুখের এমন এক আকর্ষণ ছিল যে, আমি আর কাহারও মুখ দেখিয়া কখনও সেরূপ আকৃষ্ট হই নাই।

ইংলন্ড গমন করিবার সময় রাজা আমার পিতার নিকট বিদায় লইতে আসিলেন। আমাদের বাড়ীর সকলে এবং আমাদের অনেক প্রতিবেশী রাজাকে দেখিবার জন্য আমাদের সুপ্রশস্ত প্রাংগণে একত্র হইয়াছিলেন। আমি তখন সেখানে ছিলাম না। তখন আমি সামান্য বালক। অথচ, রাজা আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি আমার পিতাকে বলিয়াছিলেন যে, আমার হস্তমর্দন না করিয়া তিনি এদেশ পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

আমার পিতা আমাকে ডাকাইয়া আনিলেন। তখন রাজা আমার হস্তমর্দন করিয়া ইংলন্ড যাত্রা করিলেন। রাজা যে সস্নেহে আমার হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন তাহার প্রভাব ও অর্থ তখন বুঝিতে পারি নাই। বয়স অধিক হইলে উহার অর্থ হৃদয়ংগম করিতে পারিয়াছি।

যখন রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুসংবাদ আসিল, তখন আমি আমার পিতার নিকটে ছিলাম। আমার পিতা বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আমারও অতিশয় শোক হইয়াছিল। যদিও রাজার সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল না, যদিও তিনি আমাকে কোন উপদেশ দেন নাই, অথচ তাঁহার মুখশ্রী এবং চরিত্র আমার হৃদয়ে গভীরভাবে অংকিত হইয়াছিল, তাহা দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলাম।

।। পাঠ-সহায়িকা ।।

উৎস : এই অংশটি নেওয়া হয়েছে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী' গ্রন্থ থেকে।

আলোচনা : এখানে কয়েকটি ছোট্ট ঘটনার বর্ণনার ভিতর দিয়ে রামমোহন সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতি আঁকা হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে রামমোহন-প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের আচার্য পদ লাভ করেন এবং ব্রাহ্মমত তাঁর প্রচারে অধিকতর জনপ্রিয়তা পায়। লেখক ভেবেছেন যে রামমোহন পূর্বাহ্নে এ ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছেন। তাই তাঁর অতি শৈশবেই তাঁকে প্রভাবিত করেছেন। এই জন্যই রামমোহন তাঁর সংগে দেখা না করে বিলেত যান নি।

মনে রেখো, এ ঘটনাগুলি বাস্তব কিন্তু ব্যাখ্যাটা ঈশ্বরভক্ত দেবেন্দ্রনাথের নিজস্ব।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

[প্রতিটি দশ নম্বর]

১। "শৈশবকাল অবধি আমার রামমোহন রায়ের সহিত সংস্রব।"– এখানে 'আমার' বলিতে কাহাকে বুঝান হইয়াছে ? শৈশবে তাঁহার সহিত কিভাবে সংস্রব ঘটে ? এই সংস্রবের ফল কি হয় ?

২। "তাঁহার স্নানটি বড় চমৎকার"–কাহার স্নানের কথা বলা হইয়াছে ? তাঁহার স্নানের বর্ণনা দাও। ইহাকে চমৎকার বলা হইয়াছে কেন ? তাঁহার প্রাতঃকালের আহার কি ছিল ? লোকে কি বলিত ?

[১+৩+২+২+২]

[illegible]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন [প্রতিটি তিন নম্বর]

১। "বাগানে একটা কাঠের দোলা ছিল"– দোলাটি কে এবং কেন টাংগাইয়াছিলেন ? এই দোলা লইয়া একটি মজার ঘটনার বর্ণনা দাও।

[১+১+১]

২। "আমি তখন সেখানে ছিলাম না"–কে, কোথায়, কখন ছিলেন না ? তিনি কিরূপে আসিলেন ?

[১+১+১]

৩। "তখন আমি আমার পিতার নিকট ছিলাম।"– কখন, কে পিতার নিকট ছিল ? তখন কি ঘটিল ?

[১+১+১]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন [প্রতিটি আট নম্বর]

প্রত্যেক ব্যাখ্যার প্রথম দুই প্রশ্ন সর্বদাই একপ্রকার হইবে।

১। কাহার রচিত কোন্ প্রবন্ধ হইতে অংশটি উদ্ধৃত ?

২। কি প্রসংগে লেখক একথা বলিয়াছেন ? (অপর প্রশ্ন উদ্ধৃতির সংগে আছে।) এই দুইটি প্রশ্নের মান [২+২]

৩। "তিনি আমাকে কখনও কথা কহিয়া উপদেশ দেন নাই।"

কথা না কহিয়া কিভাবে উপদেশ দিলেন ? কথা কহিয়া উপদেশ দিলে কি ক্ষতি হইত ? ইহার ফল কি হয় ?

[৩+৩+২]

৪। "রাজা যে সস্নেহে আমার হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব ও অর্থ তখন বুঝিতে পারি নাই। বয়স অধিক হইলে উহার অর্থ হৃদয়ংগম করিতে পারিয়াছি।"
কখন বুঝিতে পারেন নাই ? কখন পারিয়াছেন ? অর্থ ও প্রভাব কি ? হৃদয়ংগম করার ফল কি ?

[২+২+২+২]

।। ব্যাকরণগত প্রশ্ন ।। [প্রতিটি এক নম্বর]

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির প্রতিশব্দ লেখ :–
সংস্রব, উপদ্রব, প্রশান্ত, অংগচালনা, প্রশস্ত, নিগূঢ়, পুত্তলিকা, হস্তমর্দন, অনুপ্রাণিত।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলি বিশেষ্য কি বিশেষণ বল এবং পদান্তরিত কর যেমন:–
[উপদ্রব (বিশেষ্য) –উপদ্রুত (বিশেষণ)]
প্রশান্ত, প্রশস্ত, আকর্ষণ, সম্মুখ, পরিশ্রম, অনুপ্রাণিত।

৩। সন্ধি বিচ্ছেদ কর:–
ক্ষণেক, চতুষ্পার্শ্বে, ক্রমাগত, কথোপকথন।

[illegible]

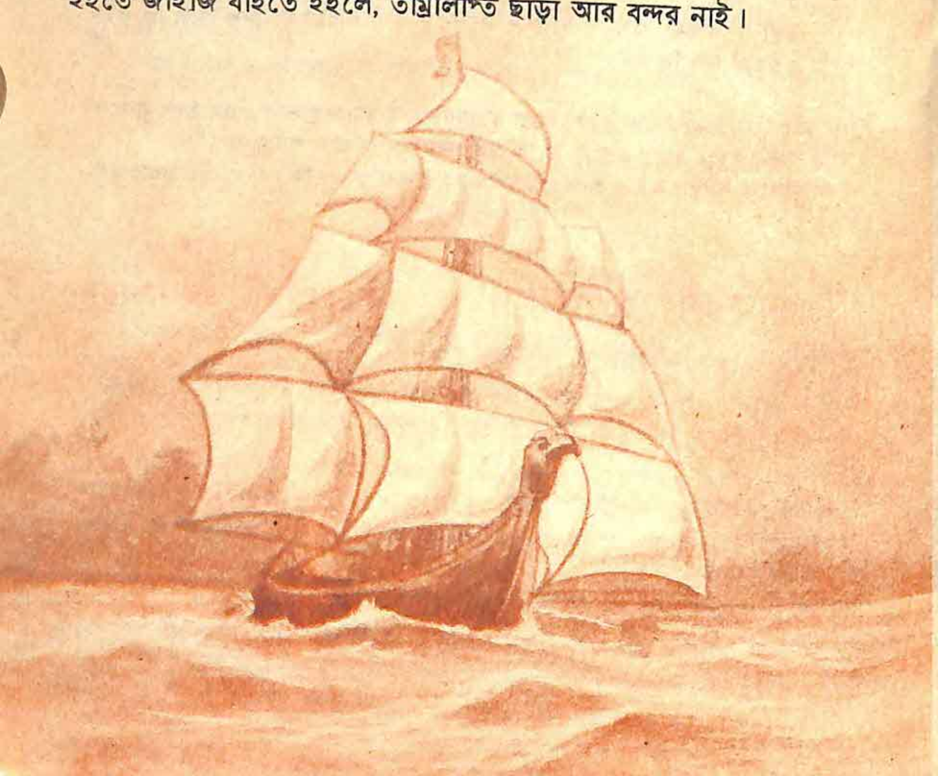
প্রাচীন বাংলার গৌরব

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বিষয় পরিচিতি :- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই আজীবন বাঙালীর লুপ্ত অতীত গৌরবের পরিচয় উদ্ধারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই ছোট্ট প্রবন্ধেও তোমরা লেখকের ঐ আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখতে পাবে। প্রাচীনকালে বাঙালীরা যে ব্যবসা-বাণিজ্যে, নৌশক্তিতে শক্তিমান ছিলেন তারই পরিচয় এই প্রবন্ধে। শুধু নদী-নালাতে নানা জাতীয় নৌকা তৈরীতেই নয় – বাঙালীরা বিশাল বিশাল জাহাজ তৈরী করেও যেত সমুদ্রে। সমুদ্রকে শাসন করতেও জানতেন তাঁরা।

বাঙলায় যেরূপ বড় বড় নদী আছে, তাহাতে বাঙালীরা যে অতি প্রাচীনকালেও নৌকা গড়িত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নৌকারও অনেক রূপ ছিল–দোনা, দুনি, ডিঙি, ভেলা, নৌকা, বালাম, ছিপ, ময়ূরপঙ্খী ইত্যাদি। এ সকল ছোট ছোট নৌকা সকল দেশেই আছে। বাঙলায় কিন্তু বড় জাহাজও ছিল।

বুদ্ধের সময়েও তাম্রলিপ্তি একটি বড় বন্দর ছিল। সুতরাং তখন যে বঙ্গ-মগধ হইতে সমুদ্রে জাহাজ যাইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বঙ্গ-মগধ হইতে জাহাজ যাইতে হইলে, তাম্রলিপ্তি ছাড়া আর বন্দর নাই।



তাম্রলিপ্তি হইতে চীন জাপানে জাহাজ যাইত শুনা যায়। কিছুদিন পর হইতেই সুমাত্রা, জাভা, বলি প্রভৃতি দ্বীপে ভারতবাসীরা যাইয়া বাস করেন এবং তথায় শৈব, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন।

কালিদাস বলিয়া গিয়াছেন, বাঙলার রাজারা নৌকা লইয়া যুদ্ধ করিতেন। পালরাজাদের যে যুদ্ধের জন্য অনেক নৌকা থাকিত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

কিন্তু মনসা ও চন্ডীমংগলের পুঁথিতেই আমরা বাঙলাদেশের নৌকাযাত্রার খুব জাঁকালো খবর পাই—চৌদ্দ, পনেরো, ষোলোখানি জাহাজ একজন সদাগর একজন মাঝির অধীনে ভাসাইয়া লইয়া নদ-নদী ও গংগা বাহিয়া সমুদ্রে পড়িতেন, সমুদ্র বাহিয়া সিংহলে যাইতেন এবং তথা হইতে চৌদ্দ-পনেরো দিন বাহিয়া মহাসমুদ্রের মধ্যে নানা দ্বীপ-উপদ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। চাঁদ সদাগরের প্রধান জাহাজের নাম মধুকর। কোন কোন পুঁথিতে লেখে যে মধুকরের বারো শত দাঁড় ছিল। দ্বিজ বংশীদাসের মনসার ভাসানে লেখা আছে সিংহল হইতে তেরো দিন মহাসমুদ্রে যাওয়ার পর ভীষণ ঝড় উঠিল। চাঁদ সদাগর কাঁদিয়াই আকুল, "আমার যথাসর্বস্ব এই নৌকাগুলিতে আছে, ইহাদের একখানিও দেখিতে পাইতেছি না। আমার নিজের প্রাণও যায়।" তিনি মাঝিকে ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন,— "তুমি ইহার একটি উপায় করো।" মাঝি মধুকর হইতে কতকগুলো তেলের পিপা খুলিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিল, ঢেউ থামিয়া গেল—দূরে দূরে সব জাহাজগুলি দেখা গেল।

যখন কেদার রায় ও প্রতাপাদিত্য খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা সর্বদাই নৌকা লইয়া যুদ্ধ করিতেন, অনেক সময় দূরদূরান্তেও যাইতেন। কিন্তু তখন তাঁহাদের সহায় ছিল পর্তুগীজ বোম্বেটের দল। ইহার পরেও আবার যখন আরাকানের রাজা ও পর্তুগীজ বোম্বেটেরা বাঙলায় বড়ই অত্যাচার আরম্ভ করিল, দেশটাকে সত্য সত্যই 'মগের মুল্লুক' করিয়া তুলিল, তখন আবার বাঙালী মাঝি দিয়াই সায়েস্তা খাঁ তাহাদের শাসন করিলেন। বঙ্গোপসাগরে বোম্বেটেগিরি থামিয়া গেল।

[সংক্ষেপিত]

।। পাঠ-সহায়িকা ।।

উৎস ।। আলোচ্য প্রবন্ধটি লেখকের 'প্রাচীন বাঙলার গৌরব' নামক গ্রন্থের এক অতিক্ষুদ্র অংশ।

আলোচনা ।। লেখক বুদ্ধদেবের আমল থেকে সায়েস্তা খাঁর কাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের ইতিহাস থেকে বাঙালীর নৌবিদ্যাচর্চার প্রমাণ উপস্থিত করেছেন। বুদ্ধদেবের

কালের নানা লেখায়, কালিদাসের কাব্যে, মনসামঙ্গল চন্ডীমঙ্গলের পুঁথিতে এবং ঐতিহাসিক কালের প্রতাপাদিত্য, কেদার রায়ের কথায় বা সায়েস্তা খাঁর কাহিনীতে যে সব তথ্য পেয়েছেন তা একত্রে গ্রথিত করেছেন এই প্রবন্ধে।

প্রবন্ধটি কিন্তু আদৌ তথ্য ভারে জর্জর নয়। পড়তে খুবই ভাল লাগে। মনে হয় গল্প পড়ছি। লেখকের ভাষা এবং বর্ণনা কৌশল মনোরম।

বিষয়বস্তু।। প্রাচীন বাংলার নৌ শক্তির গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা [illegible]

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

[প্রতিটি দশ নম্বর]

১। "মনসা ও চন্ডীমঙ্গলের পুঁথিতেই আমরা বাংলাদেশের নৌকাযাত্রার খুব জাঁকালো সংবাদ পাই।"–এই সংবাদ কি? চাঁদ সদাগরের নৌকার নাম কি? তাহার সম্বন্ধে যাহা জান বল।

[৪+২+৪]

২। বাঙলাদেশের প্রাচীন কতকগুলি নৌকার নাম বল। প্রাচীন বাঙলার জাহাজ কোথায় যাইত? এখানকার প্রধান বন্দরের নাম বল।

[৩+৪+৩]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

[প্রতিটি তিন নম্বর]

১। কালিদাসের কাব্যে বাঙলার নৌকার কি সংবাদ পাওয়া যায়?

[৩]

২। কেদার রায় ও প্রতাপাদিত্যের আমলে নৌ-শক্তি সম্পর্কে কি জান?

[৩]

৩। নীচের শব্দগুলি যে ব্যক্তি বা বিষয়কে বুঝাইতেছে তাহা বল:

[প্রতিটি তিন নম্বর]

মগধ, তাম্রলিপ্তি, কালিদাস, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য, পর্তুগীজ, জাপান, সুমাত্রা, জাভা, পালরাজাদের, মনসামঙ্গল।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

[প্রতিটি আট নম্বর]

[প্রত্যেক ব্যাখ্যার প্রথম দুই প্রশ্নে রচনা ও রচয়িতার নাম এবং প্রসঙ্গ জানিতে চাওয়া হইবে।]

১। "দেশটাকে সত্য সত্যই 'মগের মুল্লুক' করিয়া তুলিল।"
'মগের মুল্লুক' কথাটির অর্থ কি? সত্য সত্যই 'মগের মুল্লুক' হল কি ভাবে?

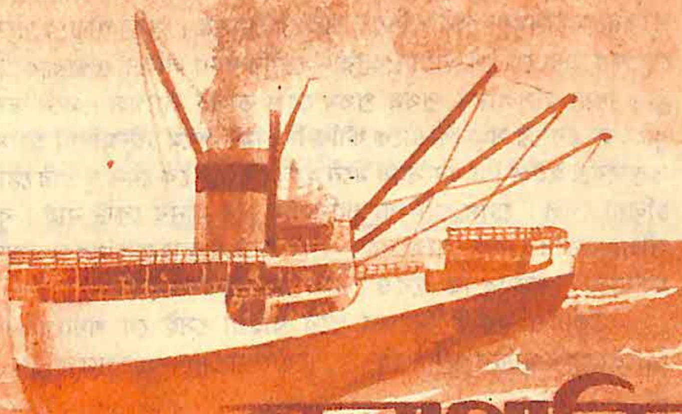
ব্যাকরণগত প্রশ্ন

১। বাক্য রচনা কর:– জাঁকালো, আকুল, মগের মুল্লুক, বোম্বেটেগিরি।

(প্রতিটি এক নম্বর)

২। সন্ধি বিচ্ছেদ কর:– প্রতাপাদিত্য, দূরদূরান্তে, অত্যাচার, বঙ্গোপসাগর।

৩। অর্থ লিখ:– ভয়ঙ্কর, স্তব, জাঁকালো, আকুল।



কালাপানির অভিজ্ঞতা

বিপিনচন্দ্র পাল

।। বিষয় পরিচিতি ।। এটি একটি ভ্রমণ কাহিনী। ভ্রমণ কাহিনীতে শুধু দেশ বা স্থানের বর্ণনাই থাকে না। থাকে লেখকের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। এই প্রবন্ধের লেখক বহুবার সমুদ্র পাড়ি দিয়েছেন। কিন্তু তাতেও সমুদ্র-পীড়ার হাত থেকে বাঁচেন নি তিনি। এখানে সেই অভিজ্ঞতার কথাই প্রধান স্থান দখল করেছে। কিন্তু তার মধ্যেই লেখক আর এক মহত্তর অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তিনি। কি সেই অভিজ্ঞতা ? প্রবন্ধ পড়লেই বুঝবে।

লিভারপুল হইতে জাহাজে চাপিয়া নিউইয়র্ক যাত্রা করি। বহুবার কালাপানি পার হইতে হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাহার সংগে আমার বনাবনি হইল না। গল্প শুনিয়াছি যে একটি ইংরেজ স্ত্রীলোক সমুদ্রযাত্রার আয়োজন করিয়া জাহাজের টিকিট কিনিলেই বমি করিতে আরম্ভ করিতেন। আমি কিন্তু ততটা পরিমাণে বমির ভয়ে ভীত নই বটে, কিন্তু সমুদ্রে একটু ঢেউ উঠিলেই আমাকে শয্যাশায়ী করিয়া ফেলে।.....

আমি ১৯00 খ্রীষ্টাব্দে ১৫ ফেব্রুয়ারী তারিখ অপরাহ্নে লিভারপুল বন্দরে জাহাজে চাপি। সমুদ্রে পড়িবার আগেই সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে এবং আমিও ঘুমাইয়া পড়ি। মধ্যরাত্রে জাগিয়া মনে হইল যেন জাহাজ আর চলিতেছে না। প্রত্যুষে উঠিয়া দেখিলাম , তাহাই সত্য। লন্ডনের ডাক লইবার জন্য জাহাজ আয়ার্ল্যান্ডের কুইনস্ টাউন বন্দরে নোঙর করিয়া

আছে। মধ্যাহ্নভোজন শেষ করিয়া ডেকে আসিয়া দেখিলাম, জাহাজ নোঙর তুলিয়া মহাসমুদ্রে পাড়ি দিতে শুরু করিয়াছে। সমুদ্রপীড়ার ভয়ে উপরের ডেকের এক কোণে যাইয়া আরাম-চৌকিখানা লইয়া ওভারকোট ও কম্বল মুড়ি দিয়া বসিলাম। প্রথম প্রথম বেশ ভালই লাগিল। মনে ভরসা হইল, বুঝি বা এবারে সমুদ্রপীড়াকে ফাঁকি দিলাম। ক্রমে চক্ষু মুদিয়া আসিল। একটু তন্দ্রাবেশ হইল। এমন সময় মনে হইল, হঠাৎ কে যেন জুতার ঠোক্কর দিয়া চলিয়া গেল। চোখ মেলিয়া দেখিলাম জন-মানব কেউ নাই। বুঝিলাম এ লীলা মানবের নহে—সাগরের। তখন ঢেউয়ে জাহাজে খুব মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। আমার ভিতরেও তোলপাড় আরম্ভ হইল।....

কোনও রকমে নিজের ঘরে যাইয়া সেই যে শয্যাগ্রহণ করিলাম, নিউইয়র্কের মাটির গন্ধ পাইবার পূর্বে আর সে শয্যা ত্যাগ করিতে পারিলাম না।....

এ সময়ের একটা ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একদিন প্রাতঃকালে আমার ক্যাবিনের খানসামা এক থালা বাদাম, কিসমিস, পেস্তা, আংগুর, মনাক্কা এবং মনে হয় যেন গোটা দুই তিন আপেলও আনিয়া দিল। জাহাজের একজন মহিলাযাত্রী এই উপঢৌকন পাঠাইয়াছেন বলিল। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, বিবেকানন্দকে তিনি গুরুর মত ভক্তি করেন। এই বিবেকানন্দের একজন স্বদেশী এই জাহাজে আছেন শুনিয়া অবধি তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয় করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। কিন্তু এ ব্যক্তি ক্যাবিন ছাড়িয়া উপরের ডেকে একবারও যান নাই বলিয়া এই মহিলার এই বাসনা তৃপ্ত হয় নাই। তবে তাঁহার শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ তিনি এই সামান্য ফল পাঠাইয়াছেন। আমি কৃতজ্ঞতাভরে তাঁহার উপহার গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রেরণ করিলাম। ফিরিয়া আসিয়া খানসামা কহিল যে, ভদ্রমহিলাটি আমাকে একবার ক্যাবিনের দরজা দিয়া হাতখানা বাড়াইতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি দেখিতে চান, আমার হাতেই তাঁহার উপহার পৌঁছিয়াছে কিনা। এবার বুঝিলাম যে এখনও দুনিয়ার শ্বেতেতর বর্ণের মর্যাদা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

।। পাঠ-সহায়িকা ।।

আলোচনা:— এটি ইংরেজ আমলের বাঙালীর জাগরণের কালের রচনা। সে কালে ইউরোপীয়েরা সাধারণতঃ ভারতীয়দের হীন চোখে দেখত। কিন্তু নানা বিষয়ে নানা মনীষী ইউরোপের শ্রদ্ধাও অর্জন করেন। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ ইত্যাদি। এখানে স্বামী বিবেকানন্দ ভক্ত এক মহিলার কথা বলেছেন। তিনি বিবেকানন্দের দেশের মানুষ বলেই বিপিন পাল মশাই এর হাত স্পর্শ করতে চেয়েছেন। স্বজাতির গর্বে রচনাটি শেষ হয়েছে।

বিষয় বস্তু॥ ইংরেজ আমলে, যে সময়ে ভারতীয়রা পাশ্চাত্য [illegible] কাছে নিন্দিত হয়েছিল এই সময়েই মার্কিন শ্বেতাঙ্গিনী, স্বামী বিবেকানন্দের দেশের মানুষ বলে [illegible] [illegible] শ্রদ্ধা [illegible], এই যুগের মনীষীরা পাশ্চাত্য

[illegible]

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন [প্রতিটি দশ নম্বর]

১। লেখক সমুদ্রপথে কোথা হইতে কোথায় যাইতেছিলেন। তিনি কি গল্প শুনিয়াছিলেন? কত তারিখে যাত্রা করেন? সেইবার তাঁহার যাত্রা কি রোগশূন্য ছিল? বুঝাইয়া বল। [২+২+১+১+৪]

২। "এ সময়ের একটা ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।"–এই ঘটনাটি বর্ণনা কর। ঘটনার তাৎপর্য কি? [৫+৫]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন [প্রতিটি তিন নম্বর]

১। "তাঁহার সঙ্গে আমার বনাবনি হইল না।"–কাহার সহিত কাহার বনাবনি হইল না? বনাবনি বলিতে কি বুঝাইয়াছেন? [১+১+১]

২। "হঠাৎ কে যেন জুতার ঠোক্কর দিয়া চলিয়া গেল।"–কে ঠোক্কর দিয়া গেল? ঘটনাটি বুঝাইয়া বল। [১+২]

৩। "তিনি গুরুর মতন ভক্তি করেন।"–কে কাহাকে ভক্তি করেন? লেখক ইহা কিরূপে জানিলেন? [১+১+১]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন [প্রতিটি আট নম্বর]

(লেখকের নাম, রচনার নাম ও প্রসঙ্গ জানিতে চাহিয়া প্রথম দুইটি প্রশ্ন থাকিবে।)

১। "বুঝিলাম, এ লীলা মানবের নহে সাগরের।"
লেখক মানবের লীলা ভাবিয়াছেন কেন? সাগরের লীলাটি কিরূপ? [২+৩+৩]

২। "এখনও দুনিয়ায় শ্বেতেতর বর্ণের মর্যাদা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।"
শ্বেতেতর বর্ণ কি? মর্যাদা কিরূপে বিলুপ্ত হয়? একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই কিরূপে? [২+১+২+৩]

৩। নীচের শব্দগুলি দ্বারা যাহা বুঝাইতেছে তাহা বুঝাও:
লিভারপুল, সমুদ্রপীড়া, কুইনস্ টাউন। [২+২+২]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

১। সন্ধি বিচ্ছেদ কর:
ব্যাকুল, তন্দ্রাবেশ, মধ্যাহ্ন, শ্বেতেতর, বিবেকানন্দ

২। বাক্য রচনা কর:
শয্যাশায়ী, তোলপাড়, ফাঁকি দেওয়া, বিলুপ্ত।

৩। অর্থ লিখ:–
অপরাহ্নে, মোহনা, প্রত্যূষে, শীতকাতর, ভরসা, মল্লযুদ্ধ, নিদর্শন।

S.C.E.R.T., West Bengal Library 25/3, B. C. ... Calcutta

শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী বিবেকানন্দ

বিষয় পরিচিতি : লেখক স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন রামকৃষ্ণদেবের শিষ্য। জগদ্বিখ্যাত এই শিষ্যটি আপন দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুর জীবনকথা শুনিয়েছেন। রামকৃষ্ণদেবের জীবনকথা সাধারণভাবে বাঙালী মাত্রেরই আকর্ষণের বস্তু। এখানে তা বলছেন স্বয়ং বিবেকানন্দ। এজন্য রচনাটির আকর্ষণ আরও বেশি।

আজ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম কোটি কোটি লোকপূর্ণ ভারতের সর্বত্র পরিচিত। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার শক্তি ভারতের বাহিরেও বিস্তৃত হইয়াছে। বঙ্গদেশে সুদূর পল্লীগ্রামে জন্মিয়া এই অশিক্ষিত বালক কেবল নিজ দৃঢ় প্রতিভা ও অন্তঃশক্তি-বলে সত্য উপলব্ধি করিয়া অপরকে প্রদান করিয়া চলিয়া গেল।

ভারতের চারিদিকে যখন নানাবিধ সংস্কার-চেষ্টা হইতেছিল, সেই সময় ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি বঙ্গদেশের কোন সুদূর গ্রামাঞ্চলে



দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে একটি বালকের জন্ম হয়। তাঁহার পিতামাতা অতি নিষ্ঠাবান সেকেলে ধরনের লোক ছিলেন, কিন্তু অনেক সময় কোন দরিদ্র অতিথিকে খাওয়াইতে গিয়া গৃহিণী সারাদিন উপবাস করিয়া থাকিতেন। এইরূপ পিতামাতা হইতে এই শিশু জন্মগ্রহণ করিলেন। অল্প বয়সেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয় এবং তিনি পাঠশালায় প্রেরিত হন।

অল্পদিন পরে তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল যে, সমুদয় লৌকিক বিদ্যার উদ্দেশ্য কেবল সাংসারিক উন্নতি। সুতরাং তিনি লেখাপড়া ছাড়িয়া আধ্যাত্মিক ভাগ্যান্বেষণে সম্পূর্ণরূপে জীবন সমর্পণ করিতে সংকল্প করিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর সংসারে প্রবল দারিদ্র্য আসিল, এই বালককে নিজের আহার সংস্থানের চেষ্টা করিতে হইল, তিনি কলিকাতার সন্নিকটে একটি স্থানে যাইয়া তথাকার মন্দিরের পুরোহিত নিযুক্ত হইলেন।

মন্দিরে আনন্দময়ী মাতার একটি মূর্তি ছিল। এই বালককে প্রত্যহ প্রাতে ও সায়াহ্নে তাঁহার পূজা নির্বাহ করিতে হইত। এইরূপ করিতে এই একভাব আসিয়া তাঁহার মনকে অধিকার করিল—"এই মূর্তির কিছু বস্তু আছে কি ? ইহা কি সত্য যে জগতে এই আনন্দময়ী মা আছেন, অথবা এসব স্বপ্নতুল্য মিথ্যা"—বালকের হৃদয়ে এই ধারণা প্রবেশ করিলে, তাঁহার সারাদিন কেবল এই ভাবনা—কিসে প্রত্যক্ষ দর্শন হইবে।

এইরূপে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস সত্যলাভের জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টায় কাটিল। তখর্খন তিনি নানাবিধ অলৌকিক দৃশ্য, অদ্ভুত রূপ দেখিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহার নিজ স্বরূপের রহস্য তাঁহার নিকট ক্রমশঃ উদ্ঘাটিত হইতে লাগিল। যেন আবরণের পর আবরণ অপসারিত হইতে লাগিল।

সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই অপূর্ব মানুষকে দেখিতে, তাঁহার সরল গ্রাম্য ভাষায় উপদেশ শুনিতে আসিতে লাগিল। তিনি যাহা বলিতেন, তাঁহার প্রত্যেক কথাতেই একটি শক্তি মাখান থাকিত, প্রত্যেক কথাই হৃদয়ের তমোরাশি দূর করিয়া দিত।

তাঁহার মানবজাতির প্রতি এইরূপ অগাধ প্রেম ছিল যে যাহারা তাঁহার কৃপালাভার্থে আসিত, এইরূপ সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে অতি সামান্য ব্যক্তিও তাঁহার কৃপালাভে বঞ্চিত হইত না। । মাসের পর মাস এরূপ হইতে লাগিল—অবশেষে এরূপ কঠোর পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গেল। ক্রমে তাঁহার গলায় একটি ঘা হইল, তথাপি তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া কথা বলা বন্ধ করা গেল না।

একদিন তিনি আমাদিগকে, সেইদিন দেহত্যাগ করিবেন, ইঙ্গিতে

জানাইলেন। এবং বেদের পবিত্রতম মন্ত্র 'ওঁ' উচ্চারণ করিতে করিতে মহাসমাধিস্থ হইলেন। এইরূপে সেই মহাপুরুষ আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

এইরূপ ব্যক্তির এক্ষণে প্রয়োজন—এই যুগে এইরূপ লোকের আবশ্যক। কোন দেশে এইরূপ ব্যক্তির যতই অভ্যুদয় হইবে ততই সেই দেশ উন্নত হইবে। আর যে দেশে এইরূপ লোক একেবারে নাই সে দেশের পতন অনিবার্য, কিছুতেই উহার উদ্ধারের আশা নাই।

(সংক্ষেপিত)

।। পাঠ-সহায়িকা ।।

রামকৃষ্ণ-জীবনের কালপঞ্জী :- জন্ম:১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৬। জন্মস্থান:-কামারপুকুর, হুগলী। বাবা—ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। বাল্যনাম গদাধর। ১৮৫৫ থেকে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির পুরোহিত। এখানেই তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। 'পরমহংস' নামে পরিচিত হন। তাঁর বাণী হ'ল, 'সব ধর্মই সত্য : যত মত তত পথ। ফরাসী মনীষী রম্যাঁ রলাঁ মনে করেন 'ত্রিশ কোটি মানুষের দুহাজার বছরের আধ্যাত্মিক জীবনের সার' হচ্ছেন রামকৃষ্ণদেব। তিনি ১৮৮৬ সালের ১৬ই আগস্ট পরলোকে গমন করেন।

আলোচনা : বিবেকানন্দ খুব সহজ ভাষায় গুরুর জীবন বর্ণনার সংগে সংগে তাঁর আবির্ভাবের সামাজিক তাৎপর্যও বর্ণনা করেছেন।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

[প্রতিটি দশ নম্বর]

১। "বঙ্গদেশের কোন্ সুদূর গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে একটি বালকের জন্ম হয়।"
এই বালকটি কে ? কত তারিখে জন্ম হয় ? তাহার পিতামাতা কেমন লেক ছিলেন ? বালকের বাল্যকাল কিরূপে কাটে ? বালক পাঠশালা ছাড়ে কেন ? সে জীবিকা নির্বাহের কি ব্যবস্থা করে ?

[১+১+২+৩+২+১]

২। মন্দিরে আনন্দময়ী মাতার একটি মূর্তি ছিল।"—এই মন্দিরটি কোথায় ? ইহার বিখ্যাত পূজক কে ছিলেন ? পূজা করিতে করিতে তাঁহার মনে কি ভাব অধিকার করে ? এই ভাবনার পরিণতি কি হইল ?

[১+১+৪+৪]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

[প্রতিটি তিন নম্বর]

১। "মাসের পর মাস এইরূপ হইতে লাগিল।"—কি হইতে লাগিল ‐ইহার ফল কি হইল ?
২। "এইরূপে এই মহাপুরুষ আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।"—এই মহাপুরুষটি কে ? তিনি কিরূপে ছাড়িয়া গেলেন ?

## ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন 	[প্রতিটি আট নম্বর]

১। "সমুদয় লৌকিক বিদ্যার উদ্দেশ্য কেবল সাংসারিক উন্নতি।"

উদ্ধৃতিটি কাহার রচিত কোন্ রচনার অংশ ? কি প্রসঙ্গে এই কথা আসিয়াছে ? লৌকিক বিদ্যা কি ? সাংসারিক উন্নতিই বা কি ? লৌকিক বিদ্যা ও সাংসারিক উন্নতির মধ্যে সম্পর্ক কি ?

[২+১+১+১+৩]

২। "এইরূপ ব্যক্তির এক্ষণে প্রয়োজন—এই যুগে এইরূপ লোকের আবশ্যক।"

উদ্ধৃত অংশ কাহার রচিত ? কোন, রচনা হইতে গৃহীত ? কোন্ প্রসঙ্গে লেখক এই কথা বলিয়াছেন ? এইরূপ ব্যক্তি বলিতে কাহাকে বুঝান হইতেছে ? এই যুগের বৈশিষ্ট্য কি ? ঐ ব্যক্তির কোন্ গুণ এযুগের জন্য প্রয়োজন ?

[১+২+১+২+২]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

১। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ:

সুদূর, দরিদ্র, অলৌকিক, আহার।

২। ভাষান্তরিত কর:

মন্দিরে আনন্দময়ী মাতার.... প্রত্যক্ষ দর্শন হইবে।

[illegible]



সেকেন্দার সাহের ভবিষ্যৎবাণী

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বিষয় উৎস নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অন্যতম বিখ্যাত নাটক 'চন্দ্রগুপ্ত'। এই নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে এই অংশ সংকলিত হয়েছে।

বিষয় পরিচিতি :- ইতিহাসে তোমরা পড়েছ যে পুরুকে পরাজিত করবার পর সেকেন্দার সাহ মগধ জয় করতে চান। কিন্তু মগধের সেনাবাহিনীর বিশালতার কথা শুনেই হোক বা রণক্লান্ত সৈন্যদের দেশে ফিরবার আকাঙ্ক্ষার জন্যই হোক, তাঁকে দেশে ফিরে যেতে হয়। নাট্যকার কল্পনা করেছেন যে, দেশে ফিরবার ঠিক আগের দিন এ ঘটনা ঘটছে।

(স্থান :– সিন্ধুতট ; দূরে গ্রীক জাহাজ শ্রেণী। কাল :– সন্ধ্যা।)

[নদীতটে শিবির-সম্মুখে সেকেন্দার ও সেলুকস অস্তগামী সূর্যের দিকে চাহিয়াছিলেন। হেলেন সেলুকসের হস্ত ধরিয়া তাঁহার পার্শ্বে দন্ডায়মানা। সূর্যরশ্মি তাঁহার মুখের উপর পড়িয়াছিল। সেকেন্দার ভারতবর্ষের প্রকৃতি ও মানুষ দেখিয়া মুগ্ধ। এমন সময় চন্দ্রগুপ্তকে ধরিয়া অ্যান্টিগোনসের প্রবেশ।]

সেকেন্দার। কি সংবাদ অ্যান্টিগোনস্? ও কে?

অ্যান্টিগোনস্। গুপ্তচর।

সেলুকস। সে কি!

সেকেন্দার। গুপ্তচর!

অ্যান্টিগোনস্। আমি দেখলাম যে এক শিবিরের পাশে বসে নির্জনে শুষ্ক তালপত্রে কি লিখছিল। আমি দেখতে চাইলাম। পত্রখানি দেখাল। পড়তে পার্লাম না।–তাই সম্রাটের কাছে নিয়ে এসেছি।



সেকেন্দার। কি লিখছিলে যুবক? সত্য বল।

চন্দ্রগুপ্ত। সত্য বল্‌ব। রাজাধিরাজ! ভারতবাসী মিথ্যা কথা বলতে এখনও শিখে নাই।

সেকেন্দার একবার সেলুকসের প্রতি চাহিলেন, পরে চন্দ্রগুপ্তকে কহিলেন–

সেকেন্দার। উত্তম। বল কি লিখছিলে?

চন্দ্রগুপ্ত। আমি সম্রাটের বাহিনী-চালনা, বূহ্যরচনা-প্রণালী সামরিক নিয়ম, এই সব মাসাবধি কাল ধ'রে শিখছিলাম।

সেকেন্দার। কার কাছে?

চন্দ্রগুপ্ত। এই সেনাপতির কাছে।

সেকেন্দার। সত্য সেলুকস?

সেলুকস। সত্য।

সেকেন্দার। (চন্দ্রগুপ্তকে) তারপর?

চন্দ্রগুপ্ত। তারপর গ্রীক সৈন্য কাল এ স্থান পরিত্যাগ করে যাবে শুনে, আমি যা শিখেছি তা এই পত্রে লিখে নিচ্ছিলাম।

সেকেন্দার। কি অভিপ্রায়ে?

চন্দ্রগুপ্ত। সেকেন্দার সাহের সঙ্গে যুদ্ধ কর্বার জন্য নহে।

সেকেন্দার। তবে–

চন্দ্রগুপ্ত। তবে শুনুন সম্রাট। আমি মগধের রাজপুত্র চন্দ্রগুপ্ত। আমার পিতার নাম মহাপদ্ম। আমার বৈমাত্র ভাই নন্দ সিংহাসন অধিকার ক'রে আমায় নির্বাসিত করেছে। আমি তারই প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছি।

সেকেন্দার। তারপর!

চন্দ্রগুপ্ত। তারপর শুনলাম মাসিডন ভূপতির অদ্ভূত বিজয়বার্তা। অর্ধেক এশিয়া পদতলে দলিত করে নদ-নদী-গিরি দুর্বার বিক্রমে অতিক্রম করে, শুনলাম তিনি ভারতবর্ষে এসে আর্যকুলরবি পুরুকে পরাজিত করেছেন। হে সম্রাট! আমার ইচ্ছা হলো যে দেখে আসি–কি সে পরাক্রম, যার ভ্রূকুটি দেখে, সমস্ত এশিয়া তাঁর পদতলে লুটিয়ে পড়ে; কোথায় সে শক্তি লুক্কায়িত আছে, আর্যের মহাবীর্যও যার সংঘাতে বিচলিত হয়েছে। তাই এখানে এসে সেনাপতির কাছে শিক্ষা কচ্ছিলাম। আমার ইচ্ছা, শুধু আমার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করা–এই মাত্র!

সেকেন্দার সেলুকসের প্রতি চাহিলেন!

সেলুকস। আমি এরূপ বুঝি নাই। যুবকের চেহারা, কথাবার্তা আমার মিষ্ট লাগত। আমি সরলভাবে গ্রীক সামরিক প্রথা সম্বন্ধে যুবকের সঙ্গে আলোচনা করতাম। বুঝি নাই যে এ বিশ্বাসঘাতক।

সেকেন্দার। যুবক!

চন্দ্রগুপ্ত। সম্রাট!

সেকেন্দার। তোমায় যদি বন্দী করি?

চন্দ্রগুপ্ত। কি অপরাধে সম্রাট?

সেকেন্দার। আমার শিবিরে তুমি শত্রুর গুপ্তচর হয়ে প্রবেশ করেছো এই অপরাধে।

চন্দ্রগুপ্ত। এই অপরাধে! ভেবেছিলাম যে সেকেন্দার সাহ বীর, দেখছি যে তিনি ভীরু! এক গৃহহীন নিরাশ্রয় হিন্দু রাজপুত্র ছাত্রহিসাবে তাঁর কাছে উপস্থিত, তাতেই তিনি ত্রস্ত। সেকেন্দার সাহ এত কাপুরুষ তা ভাবি নাই।

সেকেন্দার। সেলুকস। বন্দী কর।

চন্দ্রগুপ্ত। সম্রাট! আমায় বধ না করে বন্দী করতে পারবেন না। (তরবারি বাহির করিলেন)

সেকেন্দার। (সোল্লাসে) চমৎকার। যাও বীর। তোমায় বন্দী করব না। আমি পরীক্ষা করছিলাম মাত্র। নির্ভয়ে তুমি তোমার রাজ্যে ফিরে যাও। আর আমি এক ভবিষ্যদ্বাণী করি, মনে রেখো। তুমি হৃতরাজ্য উদ্ধার কর্বে। তুমি দুর্জয় দিগ্বিজয়ী হবে। যাও বীর! তুমি মুক্ত।

(সংক্ষেপিত)

।। পাঠ-সহায়িকা ।।

নাটক পাঠ।: তোমরা সকলে নাটক পাঠে অভ্যস্ত নও। নাটকেও গল্প বলা হয়। তবে গল্প-কথক যেমন সব কিছুই বর্ণনা করে বুঝিয়ে দেন, নাটকে তা হয় না। নাটকে প্রথমে পরিস্থিতি বোঝাবার জন্য খানিকটা বর্ণনা দিয়ে থাকেন। এখানেও প্রথমেই নাট্যকার স্থান কাল ও অবস্থার বর্ণনা করেছেন। তারপর চরিত্রগুলি নিজ নিজ কথা বলেছে এবং কাজ করেছে। তার ভিতর দিয়েই গল্প এগিয়েছে।

আলোচনা: নাট্যকার এখানে একদিকে চন্দ্রগুপ্তের সততা, দৃঢ়তা, নির্ভিকতা অন্যদিকে সেকেন্দার সাহের মহত্ব দেখাতে চেয়েছেন। মহতই মহতের মহত্বকে বুঝতে পারে। তাই সেকেন্দার বুঝেছেন চন্দ্রগুপ্তের মহত্ব। তাই তিনি ভবিষ্যৎ-বাণী করেছেন।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

[প্রতিটি দশ নম্বর]

১। সেকেন্দার সাহ কে? এই নাট্যাংশে তিনি কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন? সেকেন্দার সাহ কি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন? কে চন্দ্রগুপ্তকে ধরিয়া আনিল। কি অভিযোগে? ফল কি হইল?

[১+১+২+১+১+১+৩]

২। চন্দ্রগুপ্ত নাট্যাংশে চন্দ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আনা হয়? চন্দ্রগুপ্ত সে অভিযোগের উত্তরে কি বলেন? সেকেন্দার সাহ উক্তিটিকে কি ভাবে গ্রহণ করেন? চন্দ্রগুপ্ত সম্পর্কে সেকেন্দার সাহের ভবিষ্যৎ-বাণী কি?
[১+৩+৩+৩]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন [প্রতিটি তিন নম্বর]

১। "সেকেন্দার সাহের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য নহে।" এ-কথা দ্বারা বক্তার চরিত্র সম্পর্কে কি ধারণা জন্মে?
[৩]

২। "আমি এইরূপ বুঝি নাই।"–তিনি কে এবং কি বুঝেন নাই? কি বুঝিয়াছিলেন?
[১+১+১]

৩। "আমি পরীক্ষা করছিলাম মাত্র।"–পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থী কে? কিভাবে পরীক্ষা করা হইল?
[১+২]

৪। নীচের বিষয়গুলির পরিচয় দাও:
অ্যান্টিগোনস, সেকেন্দার সাহ, মাসিডন, পুরু, সেলুকস, ব্যূহরচনা।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন [প্রতিটি আট নম্বর]

(ব্যাখ্যার প্রথম দুই প্রশ্ন সর্বত্র এক। এইজন্য এখানে 'গ' সংখ্যা হইতে বলা হইল।)
১। "ভারতবাসী মিথ্যা বলিতে শিখে নাই।"
[৩+৩+২]

(গ) এই কথার ভিতর দিয়া বক্তার চরিত্রের কোন্ কোন্ দিক প্রকাশিত হইয়াছে?
(ঘ) "এখনও শিখে নাই।" একথা বলার তাৎপর্য কি?
[৩+৩+২]

২। "সেকেন্দার সাহ এত কাপুরুষ ভাবি নাই।"
(গ) সেকেন্দার সাহকে কাপুরুষ ভাবিবার কারণ কি? (ঘ) 'এত কাপুরুষ' বলা হইল কেন? (ঙ) ইহার ভিতর বক্তার চরিত্র কিভাবে প্রতিফলিত?
[৩+৩+২]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

১। সন্ধি বিচ্ছেদ কর:
নিরাশ্রয়, অর্ধেক, পুনরুদ্ধার, ভবিষ্যদ্বাণী, উদ্ধার।

২। পদ পরিবর্তন কর ও বাক্য রচনা কর:
নির্জন, মিথ্যা, দুর্বার, পরাজিত, ভীরু।

৩। অর্থ লিখ:
ভ্রূকুটি, আর্যকুলরবি, লুক্কায়িত, ত্রস্ত, সোল্লাসে, প্রথা, বৈমাত্র।

বিষয়বস্তু।। নাট্যাংশে চন্দ্রগুপ্তের বীরত্ব ও গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের ঔদার্য ও মহত্ত্ব প্রকাশিত। চন্দ্রগুপ্ত নির্ভীক ও স্পষ্ট- ভাষী। ভবিষ্যতে তিনি যে একজন পরাক্রমশালী সম্রাট হবেন তার ইঙ্গিত দেয়।



নিউটনের তত্ত্ব

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

বিষয় পরিচিতি :- এটি একটি বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ। এক সময় ভারতবর্ষ বিজ্ঞান-চিন্তায় বড় ছিল কিন্তু কালক্রমে এদেশে বিজ্ঞান-চর্চ্চা বন্ধ হয়ে যায়। ইংরাজ আমলে আমাদের দেশের মনীষীরা বুঝলেন যে বিজ্ঞান-ভাবনায় ভাবিত না হলে দেশের উন্নতি নেই। সেই সময়ে যারা সর্ব-সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান-চিন্তা ছড়াতে চেষ্টা করেন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাদের মধ্যে একজন। এখানে তিনি সহজ অথচ আকর্ষণীয় ভাষায় নিউটনের তত্ত্ব বুঝিয়েছেন।

প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে ইংলন্ড দেশে নিউটন জন্মিয়াছিলেন। তিনি যে বৎসর জন্মিয়াছিলেন সেই বৎসর গ্যালিলিওর মৃত্যু হয়।....

এই রকম একটা গল্প আছে যে, নিউটন একদিন এক বাগানে বসিয়া ভাবিতেছিলেন,- এমন সময় গাছ হইতে একটা আপেল ফল নীচে পড়িল। অমনি নিউটন স্থির করিলেন, পৃথিবীর এমন একটা ক্ষমতা আছে, যাহার দ্বারা অন্য বস্তুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে বা টানিয়া লয়। সেই ক্ষমতার নাম মাধ্যাকর্ষণ শক্তি।

আপেল পড়ার গল্প সত্য হউক বা না হউক তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। আপেল নীচের দিকে পড়ে, এই তত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিতে নিউটনের বহু বৎসর ধরিয়া চিন্তা করিতে হইয়াছিল। একদিনে অকস্মাৎ নিউটন তাহা বুঝিতে পারেন নাই, এবং বহু বৎসর তিনি এই বিষয়ের চিন্তা

করিয়া মনুষ্য জাতিকে যাহ' শিখাইয়া গিয়াছেন, তাহা অতি অদ্ভূত ব্যাপার।......

অন্য লোকে দেখে ফলটা পৃথিবীর দিকে যাইতেছে, নিউটন প্রথমে দেখিয়াছিলেন যে, ফল যেমন পৃথিবীর দিকে যায়, পৃথিবীও তেমনি ঠিক ফলের দিকে যায়। অন্য লোকে দেখে পৃথিবী ফলকে টানে বা আকর্ষণ করে। নিউটন দেখিয়াছিলেন, ফলটিও পৃথিবীকে টানে বা আকর্ষণ করে। উভয়ের প্রতি টান উভয়ের সমান।

তোমরা হয়ত' জিজ্ঞাসা করিবে সে আবার কি ? তবে পৃথিবী ফলের কাছে যায় না কেন ? ফলই বা পৃথিবীর দিকে যায় কেন ?

উত্তর এই–পৃথিবী খুব বড়, তাই ফল তাহাকে টানিয়াও অধিক দূর আনিতে পারে না। আর ফল খুব ছোট, তাই পৃথিবী সমান বলে টানিয়া তাহাকে আপনার দিকে আনে।

আর একটা কথা নিউটন প্রমাণ করেন। যে কারণে আম, জাম, নারিকেল পৃথিবীর দিকে যায়, সেই কারণে দূরস্থিত চন্দ্রও পৃথিবীর দিকে চলে। চন্দ্র আমাদের পৃথিবী হইতে অনেক দূরে আছে, লক্ষ ক্রোশেরও কিছু অধিক দূরে আছে। কিন্তু সেখানে থাকিয়াও চন্দ্রের অব্যাহতি নাই। গাছের নারিকেলটা যেমন পৃথিবীতে পড়িবার চেষ্টা করিতেছে, চন্দ্রও ঠিক সেইরূপ পৃথিবীতে পড়িতে যাইতেছে। প্রভেদ নাই, নারিকেলটা যতক্ষণ গাছ হইতে না খসে, যতক্ষণ উহার বোঁটা শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকে, ততক্ষণ উহা পড়িতে পারে না, আর বোঁটাটি ছিঁড়িয়া গেলেই পড়িয়া যায়। চন্দ্রকে কেহ ধরিয়া বা আটকাইয়া নাই, তাই চন্দ্র ক্রমাগত পৃথিবীর দিকে পড়িতেছে।

তোমরা হয়ত' আশ্চর্য হইবে। বলিবে,– কই চন্দ্র ত' কতদিন আমাদের মাথার উপরে উঠে, ফলের মত যদি চন্দ্রের পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে এতদিন আমাদের মাথা ভাঙিয়া যাইত। চন্দ্র পড়ে কৈ ?

কিন্তু আশ্চর্য হইও না।....

একটা ঢেলা হাত হইতে ফেলিলে হাতের ঠিক নীচে পড়ে। বেগে সম্মুখে ছুঁড়িয়া ফেলিলে, একটু দূরে পড়ে। আরও বেগে ছুঁড়িলে আরও অধিব দূর চলিয়া তাহার পর ভূমিতে পড়ে।....তবে আরও অধিক বেগে ছুঁড়িলে পৃথিবীতে না পড়িয়া একবার পৃথিবীটা ঘুরিয়া আবার কলিকাতায় আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইত। তবে একেবারে পৃথিবীর কাছ ছাড়া হইতে পারিত না।

মনে কর, চন্দ্রকেও যেন কেহ প্রভূত বেগে পূর্বমুখে ছুঁড়িয়া দিয়াছে, তাই পূর্বমুখে চলিতে সাতাইশ দিনে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আবার

স্বস্থানে ঘুরিয়া আসে ও আবার চলিতে থাকে। পৃথিবীকে একেবারে ছাড়িয়া যাইতে পারে না। চন্দ্রের যদি এই পূর্বমুখো বেগটুকু না থাকিত, তাহা হইলে চন্দ্র একদিন বৃক্ষচ্যুত নারিকেলের ন্যায় পৃথিবীতে আসিয়া আঘাত করিত।.....

নিউটনই প্রমাণ করেন, পৃথিবী যেমন নারিকেলটিকে আপনার কাছে আনিবার চেষ্টা করিতেছে চন্দ্রকেও ঠিক সেইরূপে সেই নিয়মে আপনার নিকটে আনিবার চেষ্টা করিতেছে। কলুর বলদ যেমন ঘানিগাছের চারিদিকে বাঁধা থাকিয়া ঘুরে, ইচ্ছা করিলেও অন্য পথে যাইতে পারে না, চন্দ্রও সেইরূপ বাঁধা থাকিয়া পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। তাহার অন্য পথে যাইবার যো নাই।

শুধু চন্দ্র কেন, স্বয়ং পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। শুধু পৃথিবী কেন বুধ, শুক্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি আরও কতকগুলি পদার্থ, কোনটা বা পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়, কলুর বলদের মত সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। ঘুরিতেছে সত্য, সূর্য যেন বাঁধা রহিয়াছে সত্য, কিন্তু কিরূপ দড়িতে বাঁধা আছে তাহা আমরা জানি না। হয়ত ভবিষ্যতে আর একজন নিউটন জন্মিয়া সেই দড়ি আমাদিগকে দেখাইয়া দিবেন।

।। পাঠ-সহায়িকা ।।

বিষয়-উৎস :- রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী রচিত 'চরিত-কথা' নামক গ্রন্থ থেকে সংক্ষিপ্তাকারে এই অংশ গৃহীত হয়েছে।

আলোচনা :- মনে রেখো লেখক নিউটনের জীবন-কথা বলবার জন্য মূল প্রবন্ধ রচনা করতে বসেছিলেন। কিন্তু নিউটনের তত্ত্বকে বাদ দিয়ে তো আর নিউটনের মহিমা বোঝান যায় না। তাই কথা প্রসঙ্গে এসেছে তাঁর তত্ত্বের কথা।

লেখক একটি করে বক্তব্য রেখেছেন আর সাথে সাথে তাকিয়েছেন পাঠকের মনের দিকে। পাঠকের মনের প্রশ্নটি তাঁর ভাষাতেই ধরা পড়েছে। লেখক নিজেই তার উত্তর দিতে বসেছেন। এমন প্রশ্নোত্তর ছলে জটিল তত্ত্ব বলা হয়েছে।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

[প্রতিটি দশ নম্বর]

১। নিউটন কে ? তিনি কি আবিষ্কার করেন ? তাহা কিরূপে আবিষ্কৃত হয় বলিয়া লোকের বিশ্বাস ? এই বিশ্বাস সত্য হইতে পারে কি ? কেন ?

[১+১+৩+২+৩]

২। "চন্দ্র পড়ে কৈ ?"– চন্দ্র কোথা হইতে কোথায় পড়িবে ? কেন তাহা পড়িতেছে না ? চন্দ্রের না পড়া হইতে আর কি বোঝা যায় ?

[২+৪+৪]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন [প্রতিটি তিন নম্বর]

১। "অন্য লোকে দেখে ফলটা পৃথিবীর দিকে যাইতেছে।" – কে ভিন্ন রকম দেখেন ? তিনি কি ভিন্ন দেখেন ?

[১+২]

২। চাঁদের সহিত কলুর বলদের যে তুলনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা বুঝাইয়া দাও।

[3]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন [প্রতিটি আট নম্বর]

(এই জাতীয় প্রশ্নের প্রথম দুইটি প্রশ্নাংশে লেখকের নাম, রচনার নাম ও উদ্ধৃতির প্রসংগ জানিতে চাওয়া হইবে।)

১। "উভয়ের প্রতি উভয়ের টান সমান।"

(গ) কাহার প্রতি কাহার টান ? (ঘ) টানকে কিরূপ সমান বলা যায় ? (ঙ) অন্য লোক সমান ভাবে না কেন ?

[২+২+২+২]

২। "হয়ত ভবিষ্যতে আর একজন নিউটন জন্মিয়া সেই দড়ি আমাদিগকে দেখাইয়া দিবে।"

গ) এখানে দড়ি বলিতে কি বুঝান হইয়াছে ? (ঘ) দেখাইয়া দিবার প্রয়োজন কি ? (ঙ) আর একাজে নিউটন কল্পনার কারণ কি ?

[২+২+২+২]

৩। নীচের শব্দগুলি দ্বারা যাহা বুঝ লিখিয়া জানাও :

নিউটন, মাধ্যাকর্ষণ, ঘানিগাছ।

ব্যাকরণগত প্রশ্ন [প্রতিটি এক নম্বর]

১। অর্থ লিখ :

তত্ত্ব, অকস্মাৎ, ক্রমাগত, প্রভৃত, স্বয়ং।

২। ভুল সংশোধন কর :

অব্যাহ্তি, বোটাটি, বৃহস্পতি, দড়ি বাধা।

৩। পদ পরিবর্তন কর :

আকর্যণ, উপস্থিত, বেষ্টন, পৃথিবী।

বিষয়বস্তু।। [illegible] সর্বজন পরিচিত বিজ্ঞানী নিউটন বিশ্ব-প্রকৃতি সম্পর্কে যে তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন, নিউটনের জীবন কাহিনী ও এই প্রবন্ধে মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কে নিউটনের আবিষ্কৃত সেই তত্ত্বগুলির পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

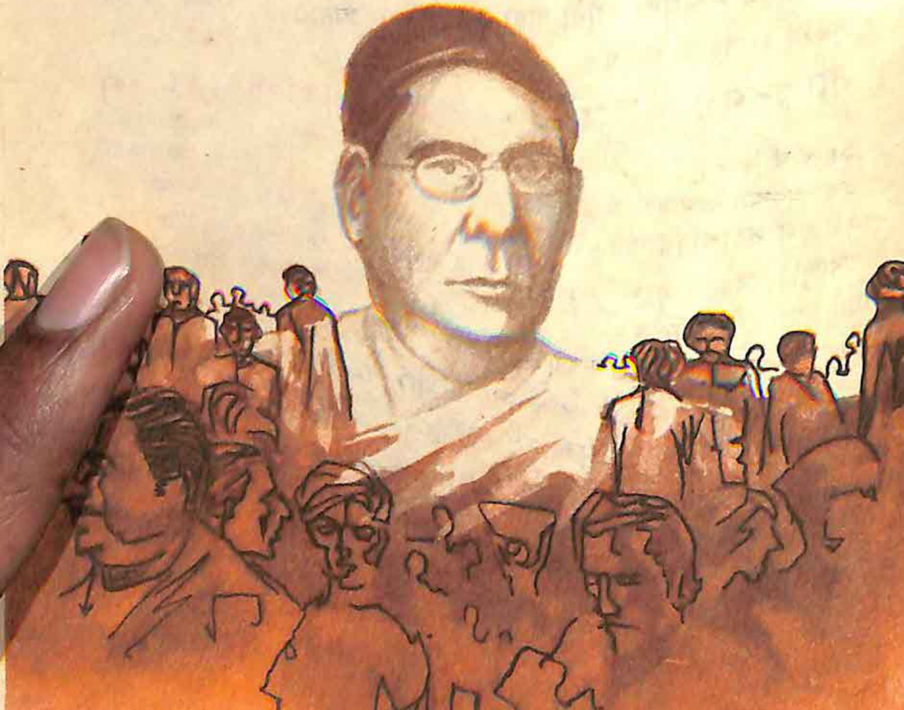
মায়ের কাজ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস

বিষয় পরিচিতি : [চিত্তরঞ্জন দাশকে দেশবন্ধু বলা হত। সত্যিই তিনি বন্ধুর মত বাঙালী তথা ভারতবাসীকে মুক্তির পথ, উন্নতির পথ দেখিয়েছেন। আলোচ্য প্রবন্ধেও তোমরা দেখবে, তিনি কেমন করে আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি দেখিয়ে, তা থেকে মুক্ত হবার পথ দেখিয়েছেন।]

আমাদের দেশের জনসাধারণকে লইয়া আমরা কার্যে প্রবৃত্ত হই নাই, তাই আমাদের দেশ আমাদের কোন কাজই আপনার বলিয়া গ্রহণ করে নাই। আমাদের উচ্চশিক্ষার অভিমান, অর্থের অভিমান, আমাদের বর্ণের অভিমান, আমাদের ধর্মের অভিমান আমাদের এমনি অন্ধ করিয়া দিয়াছে যে, যাহাদের লইয়া দেশের রক্ত, মাংস প্রাণ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদেরই বাদ দিয়া আমরা দেশের কার্যকে সার্থক করিতে চাই।

যাহার যাহা নাই, সে তাহারই বড়াই করে। যাহার প্রকৃত শিক্ষা হয় নাই, সে শিক্ষার বড়াই করিবে না ত কে করিবে? আমরা দেশের বাবুরা– প্রকৃতপক্ষে অশিক্ষিত, তাই আমাদের এত শিক্ষার অভিমান। আমরা গেঁয়ো



অশিক্ষিত লোকেদের সংগে মিশিব কি করিয়া ? তাই আমরা তাহাদের সংগে পৃথক হইয়া কাজ করিতে যাই। আমাদের মধ্যে যাহারা প্রকৃতপক্ষে ধনী, তাহারা ধনগর্বে এতই স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে যে, সাধারণ লোকের সংগে আদান-প্রদান করিতে নিজেদের অপমানিত বোধ করে। আবার আর একদল আছে, যাহাদের টাকা নাই অথচ টাকার অভিমান আছে। তাহারা বহুদিনের বসতবাটি ও স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিয়া কন্যার বিবাহ দেয় এবং নিতান্ত নির্লজ্জের মত সেই বিবাহে জাঁকজমক করে।

তাই বলিতেছিলাম, টাকার অভিমান আমাদিগকে অন্ধ করিয়াছে। এই যে 'শিক্ষিত' আর 'অশিক্ষিত', এই যে 'ধনী' অথবা টাকা না থাকিয়াও টাকার 'অভিমান', আর বাস্তবিকই যারা গরীব, ইহাদের মধ্যে নূতন করিয়া একটা বর্ণভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের দেশে এখন শাস্ত্রে যাহাকে বর্ণাশ্রম বলে তাহার চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায় না,—তাই আমাদের বর্ণাশ্রম-ধর্মের এত বড়াই।

আমি শুধু এই কথাই বলিতে চাই, আবার নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়, গড়িয়া তোল। কিন্তু তাহার আগে যাহা মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছে, সেই প্রাণহীন জিনিসটাকে টানাটানি করিয়া মিথ্যা [illegible] অভিমানের সৃষ্টি কর কেন ? এখন আমাদের সম্মুখে বিস্তৃত কার্যক্ষেত্র, এই যে দেশের কাজ, তাহা হিন্দু-মুসলমান একত্র হইয়া মিলিয়া মিশিয়া হইবে; ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, শূদ্র, চন্ডাল, সব একত্র হইয়া না করিলে কোন কার্যের সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না। যে বর্ণাশ্রম-ধর্মের অভিমান এই কার্যের অন্তরায়, আমি সেই অভিমানের কথাই বলিতেছিলাম। ঐ যে মা ডাকিতেছেন—সাবধান! সাবধান! ওঠ! জাগ! মিথ্যা অভিমানকে বর্জন কর! ঐ যে বাঙালী কৃষক সমস্ত দিন বাংগালার মাঠে মাঠে আপনার কাজ ও আমাদের কাজ শেষ করিয়া দিবা অবসানে ঘর্মাক্ত কলেবরে বাংগালার কুটীরে বাংগালার গান গাহিতে গাহিতে ফিরিতেছে, উহারা [illegible] মুসলমান হউক, [illegible] শূদ্র হউক, চন্ডাল হউক, উহারা প্রত্যেকেই যে সাক্ষাৎ নারায়ণ [illegible] মাথা নোয়াও, মাথা নোয়াও, তোমার সম্মুখে যে [illegible] অবিশ্বাসী! তোমার শুষ্ক প্রাণে আবার বিশ্বাস জাগাও, [illegible] সম্মুখে যে নারায়ণ আততায়ী! তোমার হাতের ছুরি ফেলিয়া [illegible] মত ফেলিয়া দাও, তোমার সম্মুখে যে নারায়ণ! ডাক, [illegible] প্রাণের ডাক শুনিলে কেহ কি না আসিয়া থাকিতে পারে! ও [illegible] আপনার কল্যাণকে জাগাও! বল, এস ভাই, [illegible] হও, শূদ্র হও, চন্ডাল হও, তোমাকে আলিঙ্গন [illegible] তোমার কাজ, এ যে মায়ের কাজ! একবার [illegible] গ! ডাক, [illegible] খ্রীষ্টীয় [illegible]

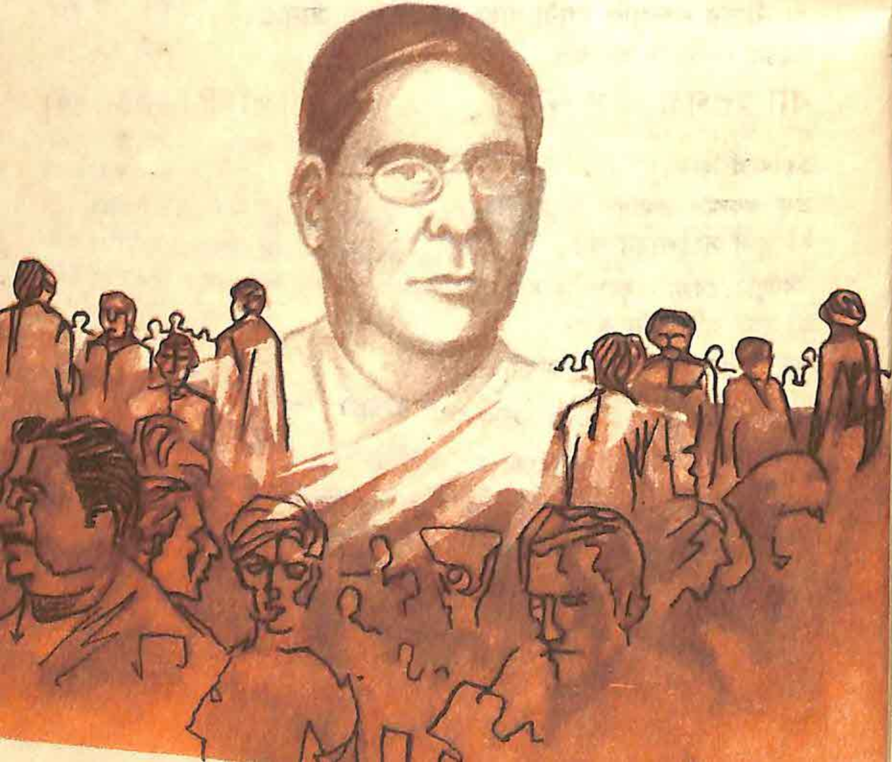
মায়ের কাজ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস

বিষয় পরিচিতি : [চিত্তরঞ্জন দাশকে দেশবন্ধু বলা হত। সতিাই তিনি বন্ধুর মত বাঙালী তথা ভারতবাসীকে মুক্তির পথ, উন্নতির পথ দেখিয়েছেন। আলোচ্য প্রবন্ধেও তোমরা দেখবে, তিনি কেমন করে আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি দেখিয়ে, তা থেকে মুক্ত হবার পথ দেখিয়েছেন।]

আমাদের দেশের জনসাধারণকে লইয়া আমরা কার্যে প্রবৃত্ত হই নাই, তাই আমাদের দেশ আমাদের কোন কাজই আপনার বলিয়া গ্রহণ করে নাই। আমাদের উচ্চশিক্ষার অভিমান, অর্থের অভিমান, আমাদের বর্ণের অভিমান, আমাদের ধর্মের অভিমান আমাদের এমনি অন্ধ করিয়া দিয়াছে যে, যাহাদের লইয়া দেশের রক্ত, মাংস প্রাণ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদেরই বাদ দিয়া আমরা দেশের কার্যকে সার্থক করিতে চাই।

যাহার যাহা নাই, সে তাহারই বড়াই করে। যাহার প্রকৃত শিক্ষা হয় নাই, সে শিক্ষার বড়াই করিবে না ত কে করিবে ? আমরা দেশের বাবুরা– প্রকৃতপক্ষে অশিক্ষিত, তাই আমাদের এত শিক্ষার অভিমান। আমরা গেঁয়ো



অশিক্ষিত লোকেদের সঙ্গে মিশিব কি করিয়া ? তাই আমরা তাহাদের সঙ্গে পৃথক হইয়া কাজ করিতে যাই। আমাদের মধ্যে যাহারা প্রকৃতপক্ষে ধনী, তাহারা ধনগর্বে এতই স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে যে, সাধারণ লোকের সঙ্গে আদান-প্রদান করিতে নিজেদের অপমানিত বোধ করে। আবার আর একদল আছে, যাহাদের টাকা নাই অথচ টাকার অভিমান আছে। তাহারা বহুদিনের বসতবাটি ও স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিয়া কন্যার বিবাহ দেয় এবং নিতান্ত নির্লজ্জের মত সেই বিবাহে জাঁকজমক করে।

তাই বলিতেছিলাম, টাকার অভিমান আমাদিগকে অন্ধ করিয়াছে। এই যে 'শিক্ষিত' আর 'অশিক্ষিত', এই যে 'ধনী' অথবা টাকা না থাকিয়াও টাকার 'অভিমান', আর বাস্তবিকই যারা গরীব, ইহাদের মধ্যে নূতন করিয়া একটা বর্ণভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের দেশে এখন শাস্ত্রে যাহাকে বর্ণাশ্রম বলে তাহার চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায় না,–তাই আমাদের বর্ণাশ্রম-ধর্মের এত বড়াই।

আমি শুধু এই কথাই বলিতে চাই, আবার নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়, গড়িয়া তোল। কিন্তু তাহারে আগে যাহা মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছে, সেই প্রাণহীন জিনিসটাকে টানাটানি করিয়া মিথ্যা অহংকারের ও অভিমানের সৃষ্টি কর কেন ? এখন আমাদের সম্মুখে বিস্তৃত কার্যক্ষেত্র, এই যে দেশের কাজ, তাহা হিন্দু-মুসলমান একত্র হইয়া মিলিয়া মিশিয়া হইবে ; ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, শূদ্র, চন্ডাল, সব একত্র হইয়া না করিলে কোন কার্যেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না। যে বর্ণাশ্রম-ধর্মের অভিমান এই কার্যের অন্তরায়, আমি সেই অভিমানের কথাই বলিতেছিলাম। ঐ যে মা ডাকিতেছেন–সাবধান ! সাবধান !ওঠ ! জাগ ! মিথ্যা অভিমানকে বর্জন কর ! ঐ যে বাঙালী কৃষক সমস্ত দিন বাংগালার মাঠে মাঠে আপনার কাজ ও আমাদের কাজ শেষ করিয়া দিবা অবসানে ঘর্মাক্ত কলেবরে বাংগালার কুটীরে বাংগালার গান গাহিতে গাহিতে ফিরিতেছে, উহারা মুসলমান হউক, শূদ্র হউক, চন্ডাল হউক, উহারা প্রত্যেকেই যে সাক্ষাৎ নারায়ণ ! অহংকারী ! মাথা নোয়াও, মাথা নোয়াও, তোমার সম্মুখে যে সাক্ষাৎ নারায়ণ ! অবিশ্বাসী ! তোমার শুষ্ক প্রাণে আবার বিশ্বাস জাগাও, জাগাও। তোমার সম্মুখে যে নারায়ণ আততায়ী ! তোমার হাতের ছুরি ফেলিয়া দাও–জন্মের মত ফেলিয়া দাও, তোমার সম্মুখে যে নারায়ণ ! ডাক। সবাইকে ডাক। প্রাণের ডাক শুনিলে কেহ কি না আসিয়া থাকিতে পারে ! ওঠ ! জাগ ! ডাক, আপনার কল্যাণকে জাগাও ! বল, এস ভাই, তুমি মুসলমান হও, খ্রীষ্টীয়ান হও, শূদ্র হও, চন্ডাল হও, তোমাকে আলিংগন করি, এ যে আমার কাজ–এ যে তোমার কাজ, এ যে মায়ের কাজ ! একবার তবে ডাকার মতো ডাক, দেখিবে

সকলেই আসিবে, দেখিবে সকল কার্যই সার্থক হইবে। আমি আবার বলি– ওঠ, জাগ, ডাক। আপনার কল্যাণকে জাগাও!

[সংক্ষেপিত]

।। পাঠ সহায়িকা ।।

উৎস : চিত্তরঞ্জন দাশ 'নারায়ণ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধ থেকে এই অংশ সংকলিত হয়েছে।

আলোচনা : লেখক আমাদের সর্বপ্রকার অভিমান ত্যাগ করে সকলের সংগে মিলে মিশে জাতির জন্য, সকলের সার্বিক উন্নতির জন্য কাজ করতে বলেছেন।

আজ থেকে পঞ্চাশ বছরেরও আগে লেখা এই প্রবন্ধের বক্তব্য কিন্তু আজও আমাদের পক্ষে প্রযোজ্য।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

[প্রতিটি দশ নম্বর]

১। 'দেশের রক্ত-মাংস-প্রাণ' বলিতে লেখক কাহাদের বুঝাইয়াছেন ? আমরা কিভাবে তাহাদের বাদ দিয়াছি ? বাদ দিবার কারণ কি ? ফল কি হইয়াছে ?

[৩+২+৩+২]

২। লেখকের মতে দেশমাতা আমাদের কি কি বলিয়া আহ্বান করেন ? লেখক 'অহংকারী', 'আততায়ী', ইত্যাদি শব্দ কেন ব্যবহার করিয়াছেন ?

[৬+৪]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

[প্রতিটি তিন নম্বর]

১। "আপন কল্যাণকে জাগাও।"–কে, কিভাবে জাগাইবে ?

[১+২]

২। "তাহাদেরই বাদ দিয়া আমরা...."–কাহাদের বাদ দিয়া ? আমরা কি করিতে চাই ?

[১+২]

৩। "আমি সেই অভিমানের কথাই বলিতেছিলাম।"–আমি কে ? কোন্ অভিমানের কথা বলিতেছিলেন ? অভিমানেরই ফলে কি হয়েছে ?

[১+১+১]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

[প্রতিটি আট নম্বর]

১। "আমাদের এখন শাস্ত্রে যাহাকে বর্ণাশ্রম বলে তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, তাই বর্ণাশ্রম ধর্মের এত বড়াই।"

কাহার রচিত কোন্ প্রবন্ধ হইতে ইহা গৃহীত? লেখক এ কথা কোন্ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন? শাস্ত্রে কাহাকে বর্ণাশ্রম ধর্ম বলে? তাহার চিহ্ন নাই কিরূপে? বড়াইটি কিরূপ?

[২+১+১+২+২]

২। "একবার তবে ডাকার মত ডাক, দেখিবে সকলেই আসিবে, দেখিবে সকল কার্যই সার্থক হইবে।"

উক্তিটি কোন্ প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত? রচয়িতা কে? প্রসঙ্গটি বর্ণনা কর? 'ডাকার মত ডাকা' বলিতে লেখক কি বুঝাইতেছেন? সকলে আসার সহিত কার্য সার্থক হওয়ার সম্পর্ক কি?

[১+১+১+২+৩]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন [প্রতিটি এক নম্বর]

১। বাক্য রচনা কর:
গড়িয়া তোলা, ভূত হওয়া, মাথা নোয়ানো।

২। সন্ধি বিচ্ছেদ কর:
সার্থক, বর্ণাশ্রম।

৩। পদান্তরিত কর:
প্রবৃত্ত, গ্রহণ, সৃষ্টি।

৪। দুটি করে সমনাম বল:
কুটীর, হাত।



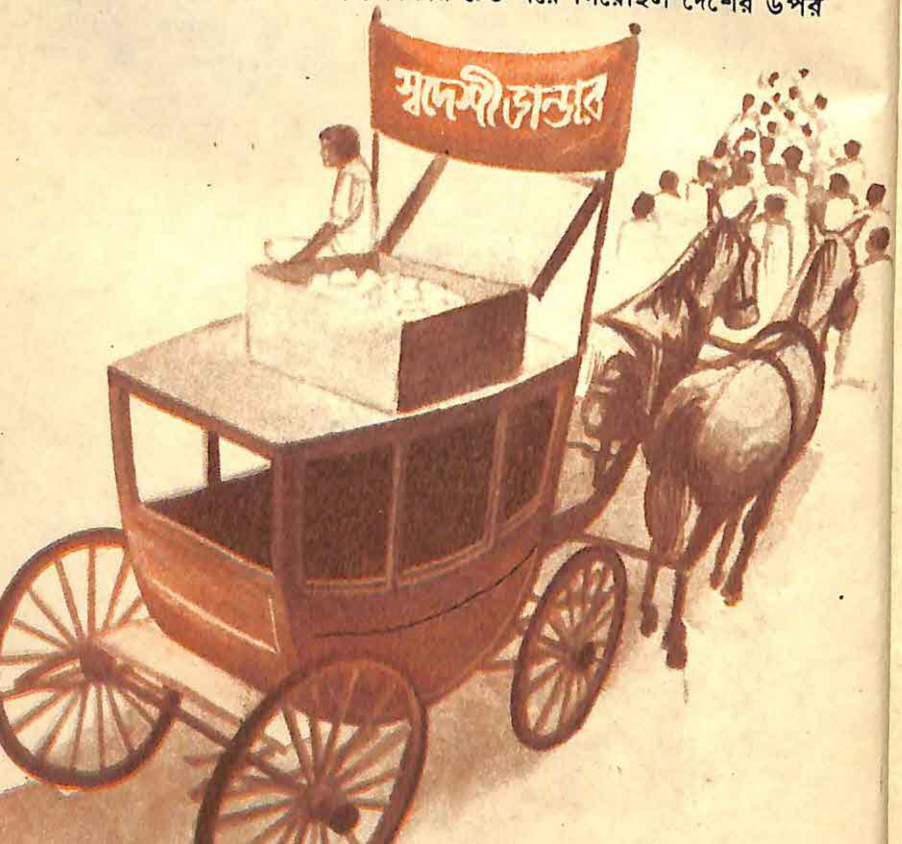
স্বদেশী যুগ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিষয় পরিচিতি : বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সারা বাঙলাদেশের মানুষ উত্তাল হয়ে উঠেছিল ১৯০৫ সালে। সারা ভারতেও সেই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তাঁর অন্যতম নেতা। এই রচনায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সময়কার একটি স্মৃতিচিত্র উপহার দিয়েছেন। রচনাটি অবনীন্দ্রনাথের স্বহস্ত লিখিত নয়, রাণী চন্দ দ্বারা অনুলিখিত। গৃহীত হয়েছে 'ঘরোয়া' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে।

সবার ভিতরেই যেন একটা তাগিদ এসেছিল। কিন্তু কে দিলে এই তাগিদ? সবাই বলে, হুকুম আয়া। আরে এই হুকুমই বা দিলে কে? কেন? তা জানে না কেউ, জানে কেবল—হুকুম আয়া.... আমি এখনো ভাবি, এ একটা রহস্য, বোধ হয় ভূমিকম্পের পরে একটা বিষম নাড়াচাড়ায়—সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল। বড়ো-ছোট, মুটে-মজুর সব যেন এক ধাক্কায় জেগে উঠল।

তখনকার স্বদেশী যুগে এখনকার মতো মারামারি ঝগড়াঝাটি ছিল না। তখন স্বদেশীর একটা চমৎকার ঢেউ বয়ে গিয়েছিল দেশের উপর



দিয়ে। এমন একটা ঢেউ, যাতে দেশ উর্বরা হতে পারত, ভাঙত না কিছু। সবাই দেশের জন্য ভাবতে শুরু করলে—দেশকে নিজস্ব কিছু দিতে হবে, দেশেব জন্য কিছু করতে হবে।

আমাদের দলের পান্ডা ছিলেন রবিকাকা। আমরা সব একদিন জুতোর দোকান খুলে বসলুম। বাড়ির বুড়ো সরকার খুঁত খুঁত করতে লাগল, বললে বাবুরা, ওটা বাদ দিয়ে স্বদেশী করুন না—জুতোর দোকান খোলা এসব কেন আবার। মস্ত সাইনবোর্ড টাঙানো হল দোকানের সামনে—'স্বদেশী ভান্ডার।' ঠিক হল স্বদেশী জিনিস ছাড়া আর কিছু থাকবে না দোকানে। । শুধু কি দোকান—জায়গায় জায়গায় পল্লী-সমিতি গঠন হচ্ছে। প্লেগ এল, সেবা-সমিতি হল, তাতে সিস্টার নিবেদিতা এসে যোগ দিলেন। চারদিক থেকে একটা 'সেলফ স্যাক্রিফাইসের' ও একটা আত্মীয়তার ভাব এসেছিল সবার মনে।

পশুপতিবাবুর বাড়ি যাচ্ছি, 'মাতৃভান্ডার সৃষ্টি' হবে—'ন্যাশনাল ফন্ড',—টাকা তুলতে হবে। ঘোড়ার গাড়ির ছাদের উপর মস্ত টিনের ট্রাঙ্ক। তাতে সাদা রঙের বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা—মাতৃভান্ডার। সবাই চাঁদা দিলে—একদিনে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা উঠে গিয়েছিল মায়ের ভান্ডারে। অনেক সাহেব সুবোও ব্যাপার দেখতে ছুটেছিল, তারাও টুপি উড়িয়ে 'বন্দে মাতরম্' রব তুলেছিল থেকে থেকে। তারা পুলিশের লোক কি খবরের কাগজের রিপোর্টার তা কে জানে।

রামকেষ্টপুরের রেলের কুলিরা খবর দিলে, বাবুরা যদি আসেন আমাদের কাছে, তবে আমরাও টাকা দেব। আমরা, রবিকাকা, সবাই ছুটলুম। তখন বর্ষাকাল—একটা টিনের ঘরে আমাদের আড্ডা হল ; এক মহুরী টাকা গুণে নিলে! অতটুকু টিনের ঘরে তো মিটিং হতে পারে না। ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে—বাইরে সারি সারি রেলগাড়ির নিচে শতরঞ্চি বিছিয়ে বক্তৃতা হচ্ছে, আর আমি ভাবছি—এই সময়ে যদি ইঞ্জিন এসে মালগাড়ি টানতে শুরু করে তবেই গেছি আর কি। এই ভাবতে ভাবতে একটা কুলি এসে খবর দিলে সত্যই একটা ইঞ্জিন আসছে। সবাই দুড়্দাড়্ করে উঠে পড়লুম।.....

রবিকাকা একদিন বললেন, রাখীবন্ধন-উৎসব করতে হবে আমাদের, সবার হাতে রাখী পরাতে হবে। ঠিক হল সকালবেলা সবাই গঙ্গায় স্নান করে সবার হাতে রাখী পরাব। এই সামনেই জগন্নাথ ঘাট, সেখানে যাব—রবিকাকা বললেন, সবাই হেঁটে যাব, গাড়ি ঘোড়া নয় ; কী বিপদ, আমার আবার হাঁটাহাঁটি ভালো লাগে না! কিন্তু রবিকাকার পাল্লায় পড়েছি, তিনি তো কিছু শুনলেন না। কি আর করি—হেঁটে যেতেই যখন হবে, চাকরকে

বললুম–নে, সব কাপড় জামা নিয়ে চল্ সঙ্গে। তারাও নিজের নিজের গামছা নিয়ে চলল স্নানে, মনিব-চাকর একসঙ্গে স্নান হবে। রওনা হলুম সবাই গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে, রাস্তার দুধারে বাড়ির ছাদ আরম্ভ করে ফুটপাথ অবধি লোক দাঁড়িয়ে গেছে–মেয়েরা খৈ ছড়াচ্ছে, শাঁখ বাজাচ্ছে, মহা ধুমধাম–যেন একটা শোভাযাত্রা। দীনুও ছিল সঙ্গে, গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে মিছিল চলল–

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক হে ভগবান।

[সংক্ষেপিত]

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন [প্রতিটি দশ নম্বর]

১। "তখন স্বদেশীর একটা চমৎকার ঢেউ বয়ে গিয়েছিল দেশের উপর দিয়ে।"
(ক) এখানে 'তখন' বলতে কখনকার কথা বলা হয়েছে ?
(খ) ঢেউটাকে চমৎকার বলা হল কেন ? (গ) দেশের ওপর দিয়ে যে বয়ে গিয়েছিল তাঁর প্রমাণ কি ?

[৩+৩+৪]

২। 'স্বদেশী ভান্ডার' আর 'মাতৃভান্ডার' কারা প্রতিষ্ঠা করেন ? স্বদেশী ভান্ডার কোথায় খোলা হয় ? মাতৃভান্ডারের জন্য কিভাবে টাকা তোলা হয় ? প্রথম দিনে কত টাকা ওঠে ?

[৩+২+৩+২]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন [প্রতিটি তিন নম্বর]

১। রামকৃষ্ণপুরে কাদের সাথে মিটিং হয় ? মিটিং-এ কে উপস্থিত ছিলেন ? কিভাবে মিটিং শেষ হল ?

[১+১+১]

২। সাহেবরা কিভাবে মাতৃভান্ডারে চাঁদা দেয় ? তারা কে হতে পারে বলে লেখকের সন্দেহ ?

[২+১]

৩। কিভাবে রাখীবন্ধন উৎসব শুরু হয় ? সে দিন কোন্ গান গাওয়া হয়।

[২+১]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন [প্রতিটি আট নম্বর]

[প্রত্যেক ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নের প্রথম দুই প্রশ্ন হইবে]
এই অংশ কোন্ রচনা হইতে গৃহীত ? কে ঐ রচনার রচয়িতা ? কোন্ প্রসঙ্গে এই কথা বলা হয়েছে ?

[২+১]

১। "সবাই বলে হুকুম আয়া। আরে এই হুকুমই বা দিলে কে ? কেন ? তা জানে না কেউ, জানে কেবল হুকুম আয়া।"
হুকুমটি কি ? হুকুমটি কে দিয়েছিল ? তাহা জানা নাই কেন ?

[৩+২+৩]

২। "চারিদিক থেকে একটা সেলফ্-স্যাক্রিফাইসের ও একটা আত্মীয়তার ভাব এসেছিল সবার মনে।"
সেলফ-স্যাক্রিফাইস কি ? ইহা চারিদিক হইতে আসিবার কারণ কি ? আত্মীয়তার ভাব বলিতে কি বুঝ ? তাহা আসিবার কারণ কি ?

[২+২+২+২]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

১। বাক্য রচনা কর : ওলোট-পালোট, উর্বরা, খুঁতখুঁত, হাঁটাহাঁটি।
২। পদ পরিবর্তন কর : স্বদেশী, গঠন, গঙ্গা, স্নান।
৩। বিপরীত শব্দ বল : আরম্ভ, মনিব, বিপদ পুণ্য।

বিষয়বস্তু॥ [illegible]

নতুনদা

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



বিষয় পরিচিতি : 'নতুনদা' নামে কলকাতা থেকে এক দাদা এসেছে ইন্দ্রর। তিনি খুব ভাল হারমোনিয়ম বাজান নাকি! তাই কোন থিয়েটার দল তাঁকে ডেকেছে হারমোনিয়ম বাজাতে। দাদার শখ তিনি নৌকায় যাবেন। তাই ইন্দ্র আর শ্রীকান্ত, তোমাদেরই মত বয়সের দুই কিশোর তাঁকে নিয়ে চলল নৌকায়। তারপর ..... দেখই না কি বিচিত্র নৌকাযাত্রা। আর তারই ভেতর দিয়ে ফুটে উঠেছে নতুনদা, ইন্দ্র আর শ্রীকান্তের চরিত্র।

সেদিন কনকনে শীতের সন্ধ্যা। আগের দিন খুব এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় শীতটা যেন ছুঁচের মত গায়ে বিঁধিতেছিল। আকাশে পূর্ণচন্দ্র। চারিদিক জ্যোৎস্নায় যেন ভাসিয়া যাইতেছে। হঠাৎ ইন্দ্র আসিয়া হাজির। কহিল,–তে থিয়েটার হবে, যাবি ? থিয়েটারের নামে একেবারেই লাফাইয়া উঠিলাম। ইন্দ্র কহিল, তবে কাপড় পরে শিগগির আমাদের বাড়ি আয়। পাঁচ মিনিটের মধ্যে একখানা র‍্যাপার টানিয়া লইয়া ছুটিয়া বাহির হইলাম। সেখানে যাইতে হইলে ট্রেনে যাইতে হয়। ভাবিলাম, উহাদের বাড়ির গাড়ি করিয়া স্টেশন যাইতে হইবে–তাই তাড়াতাড়ি।

ইন্দ্র কহিল, তা নয়। আমরা ডিঙিতে যাব। আমি নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলাম। কারণ গঙ্গার উজান ঠেলিয়া যাইতে বহু বিলম্ব হওয়াই সম্ভব। হয়ত বা সময়ে উপস্থিত হইতে পারা যাইবে না। ইন্দ্র কহিল, ভয় নেই, জোর হাওয়া আছে; দেরী হবে না। আমার নতুনদা কলকাতা থেকে

এসেছেন, তিনি গঙ্গা দিয়ে যেতে চান।

যাক, দাঁড় বাঁধিয়া পাল খাটাইয়া ঠিক হইয়া বসিয়াছি—অনেক বিলম্বে ইন্দ্রের নতুনদা ঘাটে পৌঁছিলেন। চাঁদের আলোকে তাঁহাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। কলকাতার বাবু—অর্থাৎ ভয়ঙ্কর বাবু। সিল্কের মোজা, চক্চকে পাম্প-সু, আগাগোড়া ওভারকোটে মোড়া, গলায় গলাবন্ধ, হাতে দস্তানা, মাথায় টুপি—পশ্চিমের শীতের বিরুদ্ধে তাঁহার সতর্কতার অন্ত নাই। আমাদের সাধের ডিঙিটাকে অত্যন্ত 'যাচ্ছেতাই' বলিয়া কঠোর মত প্রকাশ করিয়া ইন্দ্রের কাঁধে ভর দিয়া আমার হাত ধরিয়া, অনেক কষ্টে, অনেক সাবধানে নৌকার মাঝখানে জাঁকিয়া বসিলেন।

তোর নাম কিরে ?

ভয়ে ভয়ে বলিলাম, শ্রীকান্ত।

তিনি দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন, আবার শ্রী-কান্ত—। শুধু কান্ত। নে, তামাক সাজ। ইন্দ্র, হুঁকো-কলকে রাখলি কোথায় ? ছোঁড়াটাকে দে—তামাক সাজুক !

ওরে বাবা! মানুষ চাকরকেও ত এমন বিকট ভঙ্গী করিয়া আদেশ করে না। ইন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া কহিল, শ্রীকান্ত, তুই এসে একটু হাল ধর, আমি তামাক সাজছি।

আমি তাহার জবাব না দিয়া তামাক সাজিতে লাগিয়া গেলাম।

শীতের গঙ্গা। অধিক প্রশস্ত নয়। আধ ঘন্টার মধ্যেই ডিঙি ওপারে গিয়া ভিড়িল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাতাস পড়িয়া গেল।

ইন্দ্র ব্যাকুল হইয়া কহিল, নতুনদা, এ যে ভারি মুস্কিল হল, হাওয়া পড়ে গেল। আর তো পাল চলবে না।

নতুনদা জবাব দিলেন, এই ছোঁড়াটাকে দে-না, দাঁড় টানুক। কলকাতাবাসী নতুনদার অভিজ্ঞতায় ইন্দ্র ঈষৎ ম্লান হাসিয়া কহিল, দাঁড়! কারুর সাধ্যি নেই নতুনদা, এ স্রোত ঠেলে উজান বয়ে যায়। আমাদের ফিরতে হবে।

প্রস্তাব শুনিয়া নতুনদা এক মুহূর্তেই একেবারে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন, তবে আনলি কেন হতভাগা! যেমন করে হোক, তোকে পৌঁছে দিতেই হবে। আমায় থিয়েটারে হারমোনিয়ম বাজাতেই হবে—তারা বিশেষ করে ধরেছে।

ইন্দ্রের অবস্থা সংকট অনুভব করিয়া আমি আস্তে আস্তে কহিলাম ইন্দ্র, গুণ টেনে নিয়ে গেলে হয় না ? কথাটা শেষ হইতে না হইতেই তিনি দাঁত মুখ ভ্যাংচাইয়া উঠিলেন। বলিলেন, তবে যাও না, টানো গে না হে।

জানোয়ারের মত বসে থাকা হচ্ছে কেন?

তারপর একবার ইন্দ্র, একবার আমি, গুণ টানিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আবার তারই মাঝে মাঝে বাবুর তামাক সাজার জন্য নৌকা থামাইতে হইল। অথচ বাবুটি ঠায় বসিয়া রহিলেন–এতটুকু সাহায্য করিলেন না।

ইন্দ্র কহিল, সামনেই একটা বেশ বড় বস্তি নতুনদা, সব জিনিস পাওয়া যায়।

তবে লাগা লাগা–ওরে ছোঁড়া–ঐ, টান্‌না একটু জোরে–ভাত খাসনে? ইন্দ্র–বল্‌না তোর ঐ ওটাকে, একটু জোর করে টেনে নিয়ে চলুক।

ইন্দ্র কিংবা আমি কেহই তাহার জবাব দিলাম না। অনতিকাল পরে একটা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হলাম। এইখানে পাড়টা ঢালু এবং বিস্তৃত হইয়া জলে মিশিয়াছিল। ডিঙি জোর করিয়া ধাক্কা দিয়া সংকীর্ণ জলে তুলিয়া দিয়া আমরা দুজনে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

বাবু বলিলেন, হাত পা একটু খেলানো চাই। নাবা দরকার। অতএব ইন্দ্র তাঁহাকে কাঁধে করিয়া নামাইয়া আনিল। তিনি জ্যোৎস্নার আলোকে গঙ্গার শুভ্র সৈকতে পদচারণা করিতে লাগিলেন।

আমরা দুজনে তাঁহার ক্ষুধা-শান্তির উদ্দেশ্যে গ্রামের ভিতরে যাত্রা করিলাম।

দর্জিপাড়ার বাবু হাততালি দিয়া গান ধরিয়া দিলেন, 'ঠুনঠুন পেয়ালা'।

আমরা অনেক দূর পর্যন্ত তাঁহার সেই মেয়েলি নাকি সুর সংগীতচর্চা শুনিতে শুনিতে গেলাম।

এ অঞ্চলের পথঘাট, দোকানপত্র সমস্তই ইন্দ্রর জানা ছিল। সে গিয়া মুদির দোকানে উপস্থিত হইল। কিন্তু দোকান বন্ধ এবং দোকানী শীতের ভয়ে দরজা জানালা রুদ্ধ করিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

তখন উভয়েই বাহিরে দাঁড়াইয়া তারস্বরে চীৎকার করিয়া এবং যতপ্রকার ফন্দি মানুষের মাথায় আসিতে পারে, তাহার সবগুলি একে একে চেষ্টা করিয়া, আধঘন্টা পরে রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু ঘাট যে জনশূন্য। জ্যোৎস্নালোকে যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূরই যে শূন্য। 'দর্জিপাড়ার' চিহ্নমাত্র কোথাও নাই। ডিঙি যেমন ছিল তেমনি রহিয়াছে–ইনি গেলেন কোথায়? দুজনে প্রাণপণে চীৎকার করিলাম–নতুনদা, ও নতুনদা। কিন্তু কোথায় কে! এ অঞ্চলে মাঝে মাঝে শীতকালে বাঘের জনশ্রুতিও শোনা যাইত। গৃহস্থ কৃষকেরা দলবদ্ধ 'হুড়ারে'র জ্বালায় সময় সময় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিত। সহসা ইন্দ্র সেই কথায় বলিয়া বসিল, বাঘে নিলে না ত রে!

সহসা উভয়েরই চোখে পড়িল কিছুদূরে বালির উপর কি একটা বস্তু চাঁদের আলোয় চক্‌চক্ করিতেছে। কাছে গিয়া দেখি, তাঁরই সেই বহুমূল্য পাম্প-সু-র' এক পাটি।

* * *

সম্মুখে একটা বালির ঢিপি ছিল। সেইটা অতিক্রম করিয়াই দেখা গেল, অনেক দূরে জলের ধার ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া পাঁচ-সাতটা কুকুর চীৎকার করিতেছে। যতদূর দেখা গেল, একপাল কুকুর ছাড়া বাঘ ত দূরের কথা, একটা শৃগালও নাই। সন্তর্পণে আরও কতকটা অগ্রসর হইতেই মনে হইল, তাহারা কি-একটা কালোপানা বস্তু জলে ফেলিয়া পাহারা দিয়া আছে। ইন্দ্র চীৎকার করিয়া ডাকিল, নতুনদা!

নতুনদা এক গলা জলে দাঁড়াইয়া অব্যক্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন–এই যে আমি।

দুইজনে প্রাণপণে ছুটিয়া গেলাম, কুকুরগুলো সরিয়া দাঁড়াইল এবং ইন্দ্র ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আকন্ঠ নিমজ্জিত মূর্চ্ছিতপ্রায় তাহার দর্জিপাড়ার মাসতুতো ভাইকে টানিয়া তীরে তুলিল! আমরা গেলে সেই যে তিনি হাততালি দিয়া 'ঠুনঠুন পেয়ালা' ধরিয়াছিলেন, খুব সম্ভব, সেই সংগীতচর্চাতেই আকৃষ্ট হইয়া গ্রামের কুকুরগুলো দল বাঁধিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং এই অশ্রুতপূর্ব গীত এবং অদৃষ্টপূর্ব পোষাকের ছটায় বিভ্রান্ত হইয়া এই মহামান্য ব্যক্তিটিকে তাড়া করিয়াছিল। এতটা আসিয়াও আত্মরক্ষার কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া, অবশেষে তিনি জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন এবং এই দুর্দান্ত শীতের রাত্রে তুষার-শীতল জলে আকন্ঠ মগ্ন থাকিয়া এই অর্ধঘন্টাকাল ব্যাপিয়া পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিলেন। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের ঘোর কাটাইয়া তাঁহাকে চাঙ্গা করিয়া তুলিলেও সে রাত্রে আমাদিগকে কম মেহনত করিতে হয় নাই। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, বাবু ডাঙায় উঠিয়াই প্রথম কথা কহিলেন, আমার এক পাটি পাম্প্‌– ?

[সংক্ষেপিত]

।। পাঠ সহায়িকা ।।

উৎস : কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের এক আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'শ্রীকান্ত'। এই উপন্যাসের প্রথমখন্ডের প্রথমাংশের একটি নির্বাচিত অংশের সংক্ষিপ্ত রূপ তোমাদের দেওয়া হল।

আলোচনা : এই রচনাটি পড়তে ভারী ভাল লাগে। কিন্তু কেন ? প্রথমত: অজস্র মজাদার ঘটনা লেখক সহজ-সরল ভাষায় বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয়ত: চরিত্রগুলির ভাব-বৈচিত্র্যও লক্ষ্য করবার মত। তৃতীয়ত: লেখকের বর্ণনাভঙ্গিও আকর্ষণীয়।

গল্পটি পাঠের শেষে আমরা এমন একটা বোধে এসে পৌঁছাই যে বাইরের সাজ-সজ্জা ও আদপ-কায়দা যত বড়ই হোক, আবার আচরণ ও অপরের প্রতি সহানুভূতির মূল্যেই একজন মানুষ বড় কি ছোট তা নির্দ্ধারিত হয়।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

[প্রতিটি দশ নম্বর]

১। "কলকাতার বাবু–অর্থাৎ ভয়ংকর বাবু।"–কলকাতার বাবুটি কে ? শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রের প্রতি সে কেমন ব্যবহার করিয়াছিল ? এতে তাঁহার উপর তোমার কিরূপ ধারণা হয় ? [২+৪+৪]

২। শীতের রাত্রে নতুনদা কোথায় যাইতেছিলেন? তাঁহার যাওয়ার পথে কি বিঘ্ন ঘটিয়াছিল? তাঁহাকে কে বা কাহারা সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করে? কিভাবে উদ্ধার করে?

[২+৩+২+৩]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন [প্রতিটি আট নম্বর]

[প্রত্যেক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রথম দুই প্রশ্নে রচনার নাম, লেখকের নাম ও প্রসংগ জানিতে চাওয়া হইবে।]

১। "পশ্চিমের শীতের বিরুদ্ধে তাঁহার সতর্কতার অন্ত নাই।"
– 'পশ্চিমের শীত'-এর বৈশিষ্ট্য কি? কিরূপ সতর্কতা ছিল? লেখক এইরূপ শ্লেষাত্মক কথা কেন বলিয়াছেন?

[৩+২+৩]

২। "কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, বাবু ডাঙায় উঠিয়াই প্রথম কথা কহিলেন, আমার একপাটি পাম্প– ?"
– এই কথায় বাবুর চরিত্রের কোন্ বৈশিষ্ট্য ফুটিয়াছে? লেখক ইহাকে আশ্চর্যের ব্যাপার বলিলেন কেন?

[৪+৪]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন [প্রতিটি তিন নম্বর]

১। এই গল্পে নৌকা চালান সংক্রান্ত যতগুলি শব্দ আছে তাহা লিখ এবং তাহাদের দ্বারা একটি নৌকা-যাত্রার বর্ণনা দাও।

[১+২]

২। "তা নয় আমরা ডিঙিতে যাব।"–কে কাহাকে বলিল? 'তা নয় বলিতে কি বুঝাইতেছে?

[১+১+১]

৩। "এ যে ভারি মুস্কিল হল?"–কি মুস্কিল হইল? মুস্কিল আসান হইল কিরূপে?

[১+২]

ব্যাকারণগত প্রশ্ন [প্রতিটি এক নম্বর]

১। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ:
সংকীর্ণ, গভীর, রিক্ত, শীতল।

[১+১+১+১]

২। সন্ধি বিচ্ছেদ কর:
যাচ্ছেতাই, জ্যোৎস্নালোক।

[২]

৩। পদান্তরিত কর:
সন্ধ্যা, বিলম্ব, উপস্থিত, প্রকাশ।

[১+১+১+১]



মহালিখারূপের পর্বত অরণ্য

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিষয় পরিচিতি : না, এটিকে ভ্রমণ-কাহিনী ভেব না। এটি একটি প্রকৃতি-বিষয়ক রচনা। লেখক পাহাড় দেখবেন বলে ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা করলেন। মহালিখা রূপের পর্বতের অরণ্যে প্রবেশ করে তার নির্জনতা ও সজীবতা; সৌন্দর্য ও প্রশান্তির মধ্যে আত্মনিমগ্ন হয়ে বসে রইলেন। অরণ্য প্রকৃতির এক নিজস্ব পরিবেশে বিভূতিভূষণ বিমুগ্ধ। তিনি সুনিপুণ বাক্‌বিন্যাসে সেই পরিবেশ ও প্রশান্তিকে যেন তুলে ধরেছেন এই রচনায়।

একদিন পাহাড় দেখিব বলিয়া বাহির হইলাম। ন'মাইল ঘোড়ায় গিয়া, দুই দিকের দুই শৈলশ্রেণীর মাঝের পথ ধরিয়া চলিলাম। দুই দিকের শৈলসানু বনে বনে ভরা, পথের ধারে দুই দিকের বিচিত্র ঘন বন ও ঝোপের মধ্য দিয়া সুঁড়িপথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে, কখনও উঁচু নীচু, মাঝে মাঝে ছোট ছোট পার্বত্য ঝরণা উপলাস্তৃত পথে বহিয়া চলিয়াছে, বন্য চন্দ্রমল্লিকা ফুটিতে দেখি নাই ; কারণ তখন শরৎকাল, চন্দ্রমল্লিকা ফুটিবার

সময়ও নয়, কিন্তু অজস্র বন্য শেফালিবৃক্ষ বনের সর্বত্রই ফুলের খই ছড়াইয়া রাখিয়াছে, বৃক্ষতলে, শিলাখন্ডে, ঝরণার উপলাকীর্ণ তীরে। আরও কত কি বিচিত্র বন্যপুষ্প ফুটিয়াছে, বর্ষাশেষে, পুষ্পিত সপ্তপর্ণের বন, অর্জুন ও পিয়াল, নানা জাতীয় লতা ও অর্কিডের ফুল—বহুপ্রকার পুষ্পের সুগন্ধ একত্র মিলিত হইয়া মৌমাছিদের মতো মানুষকেও নেশায় মাতাল করিয়া তুলিয়াছে।

এতদিন এখানে আছি, এ সৌন্দর্যভূমি আমার কাছে অজ্ঞাত ছিল। এখানকার জঙ্গল ও পাহাড়কে দূর হইতে ভয় করিয়া আসিয়াছি। বাঘ আছে, সাপ আছে, ভল্লুকের নাকি লেখাজোখা নাই,—এ পর্যন্ত তো একটা ভল্লুকও কোথাও দেখিলাম না। লোকে যতটা বাড়াইয়া বলে ততটা নয়।

ক্রমে পথটার দু'ধারে বন ঘনাইয়া পথটাকে দুদিক হইতে চাপিয়া ধরিল। বড় বড় গাছের ডালপালা পথের উপর চন্দ্রাতপের সৃষ্টি করিল। ঘন-সন্নিবিষ্ট কালো কালো গাছের গুঁড়ি, তাদের তলায় কেবলই নানাজাতীয় ফার্ণ, কোথাও বড় গাছেরই চারা। সামনে চাহিয়া দেখিলাম পথটা উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে। অপূর্ব গম্ভীর শোভা এই জায়গাটায়। পথটা বাহিয়া পাহাড়ের উপর অনেক দূর উঠিলাম, আবার পথটা নামিয়া গড়াইয়া গিয়াছে, কিছুদূর নামিয়া আসিয়া একটা পিয়ালতলায় ঘোড়া বাঁধিয়া শিলাখন্ডে বসিলাম।

চুপ করিয়া কতক্ষণ বসিয়া রহিলাম। কাছেই বনের মধ্যে কোথায় একটা ঝরণার কলমর্মর সেই শৈলমালাবেষ্টিত বনানীর গম্ভীর নিস্তব্ধতাকে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। আমার চারিধারেই উঁচু উঁচু শৈলচূড়া, তাদের মাথায় শরতের নীল আকাশ। কতকাল হইতে এই বন, এই পাহাড় এই রকমই আছে। সুদূর অতীতে আর্যেরা খাইবার গিরিবর্ত্ম পার হইয়া প্রথম যেদিন পঞ্চনদে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই বন তখনও এই রকমই ছিল, বুদ্ধদেব তরুণী পত্নীকে ছাড়িয়া যে রাত্রে গোপনে গৃহত্যাগ করেন, সেই অতীত রাত্রিতে এই গিরিচূড়া গভীর চন্দ্রালোকে আজকালকার মতই হাসিত; তমসাতীরের পর্ণকুটীরে কবি বাল্মিকী একমনে রামায়ণ লিখিতে লিখিতে কবে চমকিয়া উঠিয়া দেখিয়াছিলেন, সূর্য অস্তাচলচূড়াবলম্বী, তমসার কালো জলে রক্তমেঘস্তূপের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে, আশ্রম-মৃগ আশ্রমে ফিরিয়াছে, সেদিনও পশ্চিম দিগন্তের শেষ রাঙা আলোয় এই মহালিখা রূপের শৈলচূড়া এমনই অনুরঞ্জিত হইয়াছিল, আজ আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে কেমন হইয়া আসিতেছে। সেই কতকাল আগে যেদিন চন্দ্রগুপ্ত প্রথম সিংহাসনে আরোহণ করেন, গ্রীক রাজদূত হেলিওডোরাস গরুড়ধ্বজ-স্তম্ভ নির্মাণ করেন; রাজকন্যা সংযুক্তা

যেদিন স্বয়ংবর সভায় পৃথ্বীরাজের মূর্তির গলায় মাল্যদান করেন; সামুগড়ের যুদ্ধে হারিয়া হতভাগ্য দারা যে রাত্রে আগ্রা হইতে গোপনে দিল্লী পলাইলেন; চৈতন্যদেব যেদিন শ্রীবাসের ঘরে সংকীর্তন করেন; যেদিনটিতে পলাশীর যুদ্ধ হইল—মহালিখা রূপে ঐ শৈলচূড়া, এই বনানী ঠিক এমনি ছিল। তখন কাহারা বাস করিত এইসব জঙ্গলে ?

[সংক্ষেপিত]

।। পাঠ-সহায়িকা ।।

উৎস : বাঙলা কথা-সাহিত্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি সুপরিচিত নাম। সরল গ্রাম্যজীবন ও অরণ্য প্রকৃতি তাঁর রচনায় বিশিষ্টতা পেয়েছে। তাঁর লেখা গ্রন্থাদি বাঙলা সাহিত্যের অমূল্য-সম্পদ। উদ্ধৃত রচনাংশ 'আরণ্যক' উপন্যাস থেকে গৃহীত।

আলোচনা : প্রকৃতির রূপ সৌন্দর্য ইত্যাদি লেখকের লক্ষ্য নয়। তিনি প্রকৃতির রাজ্যে এসেছেন তার শান্তি ও স্তব্ধতা উপভোগ করতে। শহর ও সভ্যতার পরিবর্তনশীলতায় লেখক অতৃপ্ত। এখানে এসে তাঁর মনে হয়েছে, তিনি এক অপরিবর্তনশীল রাজ্যে এসে পৌঁছেছেন। সুদূর অতীতে আর্যেরা যেদিন ভারতে প্রবেশ করেছে বা বুদ্ধদেব যেদিন গৃহত্যাগ করেছেন সেদিন থেকে আজও প্রকৃতি একই জীবনরীতিতে আবর্তিত হচ্ছে। অতীতের সঙ্গে এই সম্পর্কবোধ লেখককে আনন্দিত করেছে।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন [প্রতিটি দশ নম্বর]

১। "একদিন পাহাড় দেখিব বলিয়া বাহির হইলাম।"—বক্তা কে ? তিনি কয় মাইল গেলেন ? কিভাবে গেলেন ? বাহির হইয়া তিনি কি দেখিলেন ? [১+১+২+৬]

২। পাহাড়ের জঙ্গলে গিয়া লেখক কি কি ফুল দেখেন ? এই প্রবন্ধে কি কি গাছের নাম পাও ? লেখক শিলাখন্ডে বসিয়া কি ভাবেন ? এইরূপ ভাবনা কখনও তোমার মনে উদয় হয় কি ? [৩+২+২+২]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন [প্রতিটি তিন নম্বর]

১। "চন্দ্রমল্লিকা ফুটিবার সময়ও নয়।"—তখন কি কাল ? কি ফুল ফুটিয়াছিল ? [২+১]

২। "লোকে যতটা বাড়াইয়া বলে ততটা নয়"—লোকে কি বাড়াইয়া বলে ? ততটা নয় কেন ? [২+১]

[illegible]

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের পরিচয় দাও: [প্রতিটি দুই]

বাল্মীকি, বুদ্ধদেব, হেলিওডোরাস্, সংযুক্তা, চৈতন্যদেব, শ্রীবাস, দারা, পৃথ্বীরাজ।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন [প্রতিটি আট]

[এই জাতীয় প্রথম প্রশ্নের প্রথম দুই প্রশ্নাংশে লেখকের নাম, রচনার নাম ও প্রসংগ জানিতে চাওয়া হইবে।]

১। "অপূর্ব গম্ভীর এই জায়গাটার শোভা।"

(ক) শোভাকে গম্ভীর বলিবার কারণ কি ? (খ) জায়গার সৌন্দর্য বর্ণনা কর।

[২+২+২+২]

২। "তখন কাহারা বাস করিত এইসব জংগলে ?"

(গ) এখানে 'তখন' বলিতে কি বুঝান হইয়াছে ? (ঘ) কাহারা বাস করিত তাহা কি অনুমান করা যায় ?

[২+২+২+২]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন [প্রতিটি এক]

১। পার্থক্য দেখাইয়া বাক্য রচনা কর :–

উঁচু ও উঁচু-উঁচু, ছোট ও ছোট-ছোট, কালো ও কালো-কালো, লিখিয়া ও লিখিতে-লখিতে।

২। সন্ধিবদ্ধ কর :–

চন্দ্র+আলোক, উপল+আস্তৃত, চূড়া+অবলম্বী।

[১+১+১]

৩। অর্থ বল :– [প্রতিটি দুই]

শৈলসানু, উপলাস্তৃত, সুঁড়িপথ, চন্দ্রাতপ, গিরিবর্ত্ম, কলমর্মর, অনুরঞ্জিত, বনানী।





এভারেস্ট অভিযান

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

বিষয় পরিচিতি : পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু শৃংগ এভারেস্ট, এর উচ্চতা ২৯,০২৮ ফুট। ঋতুভেদে এই উচ্চতা কিছু কম বেশি হয়। এই এভারেস্ট শৃংগে উঠবার কোন সহজ পথ নেই। তাই বার বার এই পর্বত জয়ের চেষ্টা হয়েছে ব্যর্থ। অবশেষে ১৯৫৩ সালে ভারতীয় শেরপা তেনজিং প্রথম উঠলেন শৃংগে। শেষে টেনে তুললেন দলনেতা হিলারীকে। মানুষ জয় করল এভারেস্টকে।

এখানে মানুষের সেই বিজয় অভিযানের গল্প বলা হয়েছে।

বিজ্ঞানের বিস্ময়কর প্রসারের সংগে সংগে পাশ্চাত্য জাতিদের মনে জেগে উঠল এক অপরূপ অ্যাডভেঞ্চারের স্পৃহা—জ্ঞানের সুতীব্র পিপাসা....আকাশে সাগরের তলায়, পৃথিবীর ওপর, কিছুই থাকবে না তার অজানা। মানুষ হবে অপরাজেয়....দৃষ্টি এসে পড়ল অপরাজেয় এভারেস্টের ওপর। মানুষের পদচিহ্ন যেখানে যেখানে পড়েনি, সেই সেই স্থানে হলো তাদের লক্ষ্য। অভিযান শুরু হলো। অভিযাত্রীদল চললেন জয়যাত্রায়। কত প্রাণ বলি পড়ল। কত ব্যর্থতা এল। এমনি করে অভিযাত্রীদের প্রয়াসে একদিন সার্থক হলো অভিযান। উত্তুংগ এভারেস্ট মানুষের চরণচিহ্ন বুকে ধরল। তারই শৃংগে উড়ল মানুষের বিজয়নিশান।

১৯৫৩ সাল। কর্ণেল হান্ট এবার অভিযাত্রীদের অধিনায়ক। এ দলে ছিলেন ভারতীয় অধিবাসী তেনজিং। বহু অভিযানে অভিজ্ঞতা আছে তাঁর।

নিষিদ্ধ দেশ তিব্বতের পথে অভিযানের চেষ্টা চলেছিল বহুবার, তারপর নেপালের পথে শুরু হয়। এবারও নেপালের পথে চললেন। রাজধানী কাঠমান্ডু থেকে এলেন নামচেবাজার, তারপর সেখান থেকে সায়াংবকের দিকে। নামচেবাজারে এসে অভিযাত্রীরা কয়েকদিনের জন্য বিশ্রাম করলেন। তারপর সেখান থেকে তাঁরা যাত্রা করলেন সায়াংবকের দিকে।

তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করে রইলেন। কারণ, এইখানে হিমালয়ের তুহিন প্রকৃতির সংগে অভিযাত্রী আর শেরপাদের নিজেদের অভ্যস্ত করে তুলতে হয়। তাছাড়া, এইখান থেকেই শুরু হয় পথঘাট জরিপ করে দেখা, নতুন কোন ভাল পথ খুঁজে পাওয়া যায় কিনা, সামনের পথের অবস্থা কি রকম, পরবর্তী তাঁবু কোন জায়গায় স্থাপন করা সম্ভব হবে, সব এখান থেকেই নির্ধারিত হয়। সব বন্দোবস্ত হয়ে গেল। তারপর আবার যাত্রা। দুর্গম পথ–মৃত্যুর ছায়াঘন পথ। মৃত্যুঞ্জয়ী বীর না হলে এ পথে এগুনো যায় না।

একদল আরোহণের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন। তারপর ১৮ই মে যাত্রা করলেন তেনজিং আর হিলারী। সামনে খাড়া পথ। পদে পদে নিজের হাতে বরফ কেটে ধাপ তৈরি করে সেই খাড়া পথে উঠতে তাঁদের দুজনের মেরুদন্ড যেন ভেংগে পড়তে লাগল। তার ওপর তাঁরা ভীত হয়ে দেখলেন, তাঁদের অক্সিজেন যন্ত্রের অক্সিজেন প্রয়োজনীয় মাত্রার চেয়ে অনেক কম রয়েছে। তখন বাধ্য হয়ে তাঁরা কম মাত্রায় অক্সিজেন দিতে লাগলেন।

সেদিন ২৭৮00 ফুট উঁচুতে তাঁবু ফেলা হয়েছিল। এর আগে এত উঁচুতে আর কোন তাঁবু ফেলা হয়নি। এই তাঁবুতে কোনো রকমে একজন মানুষ ধরে। তাতেই থাকার মত করে তেনজিং আর হিলারী সেই ছোট্ট তাঁবুতে রাত কাটাবার ব্যবস্থা করলেন। সংগে যে সাহায্যকারী দল এসেছিল, তারা ফিরে গেল। তেনজিং আর হিলারী সেই তুষার নীড়ে কম্পিত বুকে রাত্রি প্রভাতের অপেক্ষায় রইলেন। এভারেস্টের চূড়ায় বরফ গলা হিমের রাত্রিতে চারিদিকে রহস্যময় মহানীরবতা, তার মধ্যে দুটি মানুষ ঘুমিয়ে।

রাত্রি প্রভাত হলো তুষারের নীড়ে। তাঁবুর ফাঁক দিয়ে তেনজিং বাইরে চেয়ে দেখলেন, পরিষ্কার স্বচ্ছ এক অপরূপ সুন্দর প্রভাত, তুষারে তুষারে ঝলমল করছে.....নীচে বহুদূরে থিয়াংবুচির বৌদ্ধমঠটি দেখা যাচ্ছে, যেন সাদা কাপড়ের ওপর ছোট একটা কালো দাগ।

২৯শে মে ভোর ৬টা বাজতেই তেনজিং আর হিলারী শেষ অভিযানের জন্য সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ৯টার সময় তাঁরা দক্ষিণ চূড়ায় এসে

উঠলেন, সেখান থেকে এভারেস্টের মূল চূড়া হলো আর আধ মাইল মাত্র। সেখানে এসে মিনিট দশেক তাঁরা একটু বিশ্রাম করে নিলেন। মুখ থেকে অক্সিজেন নেবার জন্য মুখোসটা খুলে ফেললেন, দেখলেন, বিশেষ কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

অক্সিজেন যন্ত্রের দিকে চেয়ে তাঁরা ভীত হয়ে উঠলেন। যেটুকু অক্সিজেন আছে, তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। স্বাভাবিক মাত্রায় যদি নেওয়া হয়, তাহলে চূড়ায় পৌঁছতেই ফুরিয়ে যাবে। তখন ফিরে আসা অতি কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তখন তাঁরা হিসেব করে অক্সিজেনের মাত্রা কমিয়ে দিলেন। তাতে অবশ্য নিঃশ্বাস নিতে একটু অসুবিধা হতে লাগল, কিন্তু দুর্জয় পণ যাঁদের মনে, তাঁরা অসুবিধা সত্ত্বেও ওপরে গিয়ে দাঁড়াতে পারেন।

সেখান থেকে সেই আধ মাইল পথ অতিক্রম করতে আড়াই ঘন্টা লাগল। সাড়ে এগারটার সময় তেনজিং এভারেস্টের চূড়ায় গিয়ে উঠলেন, তারপর হিলারীকে হাত বাড়িয়ে ওপরে তুলে নিলেন। পঞ্চাশ বছর ধরে মানুষের অবিরাম অবিশ্রান্ত সাধনা সেদিন জয়যুক্ত হলো।

[সংক্ষেপিত]

।। পাঠ-সহায়িকা ।।

ইতিকথা : ১৯৫৩ সালের ২৯শে তারিখে এভারেস্ট শৃঙ্গে মানুষের পায়ের ছাপ পড়ে। কিন্তু ১৮৯৩ সাল থেকে এভারেস্ট অভিযানের পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। ১৯২১ সালে প্রথম অভিযান পরিচালিত হয় হাওয়ার্ড ব্যুরির নেতৃত্বে। এর পর থেকে নানা ব্যর্থ অভিযান চলে। তেনজিং-হিলারীর অভিযানই প্রথম সার্থক অভিযান।

আলোচনা :— লেখক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের গল্প বলার ঢংটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবে। অভিযাত্রীদের দুঃখ বেদনা, কঠোর সংগ্রাম তিনি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাদের সংকটকালগুলি পাঠক উৎকন্ঠার সঙ্গে অতিক্রম করে। অবশেষে আসে বিজয় ঘোষণা। মুক্তি ও জয়ের আনন্দে গল্প পরিসমাপ্ত।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন [প্রতিটি দশ নম্বর]

১। এভারেস্ট কোথায় ? কি কারণে এভারেস্ট অপরাজিত ছিল ? কিভাবে এভারেস্ট পরাজিত হল ? এই অভিযানের শেষ পর্যায়ের বর্ণনা দাও।

[১+২+২+৫]

২। কাঠমান্ডু থেকে অভিযাত্রীরা কোথায় যান ? তাঁদের পরবর্তী বিশ্রাম স্থান কোথায় ছিল ? সেখানে তাঁরা কতদিন ছিলেন ?

[১+১+২+৬]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

[প্রতিটি তিন নম্বর]

১। "সব বন্দোবস্ত হয়ে গেল।"–কোথায়, কাহারা বন্দোবস্ত করিলেন? কি কি বন্দোবস্ত?

[১+২]

২। "তার মধ্যে দুটি মানুষ ঘুমিয়ে।"–কোথায়? কিসের মধ্যে? মানুষ দুটি কে কে?

[১+১+১]

৩। "তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়।"–কি পর্যাপ্ত নয়? পর্যাপ্ত না থাকায় কি করা হইল?

[১+২]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

[প্রতিটি আট নম্বর]

১। "বিজ্ঞানের বিস্ময়কর প্রসারের সংগে সংগে পাশ্চাত্য জাতিদের মনে জেগে উঠল এক অপরূপ অ্যাডভেঞ্চারের স্পৃহা।"

– কাহার রচিত কোন্ প্রবন্ধ হইতে অংশটি উদ্ধৃত? লেখক কি প্রসংগে ইহা বলিয়াছেন? বিজ্ঞানের প্রসার কিরূপে হইয়াছিল? পাশ্চাত্য জাতিদের মনে' বলিতে লেখক কি বুঝাইতেছেন? তাহার ফল কি হয়?

[২+১+২+১+২]

২। "মৃত্যুঞ্জয়ী বীর না হলে এ পথে এগুনো যায় না।"

– কাহার রচিত কোন্ রচনার অংশ ইহা? কি কথা প্রসংগে একথা বলা হইয়াছে? মৃত্যুঞ্জয়ী বীর বলিতে কি বুঝ? এই পথের কি বিশেষত্ব আছে? মৃত্যুঞ্জয়ী বীর ভিন্ন কেন 'এগুনো' সম্ভব নয়?

[১+১+২+২+২]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

[প্রতিটি এক নম্বর]

১। সন্ধি বিচ্ছেদ কর: ব্যর্থ, দশেক, হিমালয়, পরিষ্কার।

[১+১+১+১]

২। সমাসের নাম বল ও ব্যাসবাক্য বল: চরণচিহ্ন, রাজধানী, পথঘাট, জয়যুক্ত।

[২+২+২+২]

৩। ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর:
পাশ্চাত্য, অভ্যস্ত, নির্ধারিত, কম্পিত।

[২+২+২+২]



ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

দক্ষিণারঞ্জন বসু



বিষয় পরিচিতি :— [পলাশীর যুদ্ধে লর্ড ক্লাইভের মাত্র তিন হাজার সৈন্যের কাছে পরাজিত হল নবাব সিরাজউদ্দৌলার আটাত্তর হাজার সৈন্যের বিরাট বাহিনী। সেটা ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা। যে-আত্মঘাতী ষড়যন্ত্রের ফলে ভারতের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হল, সেই ষড়যন্ত্রের প্রধান নায়ক ছিলেন নবাবের প্রধান সেনাপতি মীরজাফর, সুদখোর জগৎশেঠ প্রভৃতি বিশ্বাসঘাতকের দল। তাঁদের ষড়যন্ত্রে পরাধীন হল ভারতবর্ষ।

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন স্থায়ী করবার জন্য ইংরেজরা এদেশে ইংরেজী শিক্ষা চালু করে। কিন্তু ইংরেজদের সে ইচ্ছাকে বানচাল করে দিয়ে, ইংরেজী শিক্ষিত মানুষেরাই শুরু করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম। এখানে সংক্ষেপে সেই কাহিনী বলা হয়েছে।]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংরেজী শিক্ষার সুফলকে আত্মসাৎ করে যে কয়জন ভারতবাসী দেশের নব জাগরণের সূত্রপাত করেন, তাঁদের প্রথমতম পুরুষ রাজা রামমোহন রায়। চিন্তার মুক্তি যখন ঘটে, তখন তার বিকিরণ লক্ষ্য করা যায় সর্বত্র। সতীদাহ প্রথা নিবারণ, বিধবাবিবাহ প্রবর্তন প্রভৃতি ব্যাপারে যেমন মানুষ উৎসাহিত হল, তেমনি দেখা দিল নতুন সাহিত্য, সৃষ্টি হল রঙ্গমঞ্চের। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষদেরও মোহভঙ্গ হল তখনই। তাঁরা বুঝলেন, ইংরেজদের অনুগ্রহে দারিদ্র মোচন হলেও দাসত্ব মোচন হয় না। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন, 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়।' বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র

সন্ন্যাসীরা উচ্চারণ করলেন স্বাধীনতার মন্ত্র, 'বন্দেমাতরম্'। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবাসীকে সম্বোধন করে বললেন, " হে বীর, সাহস অবলম্বন কর। সদর্পে বল, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই।"

১৮00 খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে শুরু হল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। তার ঢেউ ভারতবাসীর অন্তরেও সাড়া জাগাল। তার ফলে ভারতবাসীর মনে জাগল রাজনৈতিক চেতনা। তাঁরা দাবি করলেন, নিজেদের দেশ আমরা নিজেরাই শাসন করব। আমরা রাজনৈতিক অধিকার চাই। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে বংলায় গড়ে উঠল 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন'। ঠিক এই সময়ে রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র প্রমুখের উদ্যোগে 'হিন্দুমেলা' প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁরা স্বদেশী শিক্ষা, দেশাত্মবোধক কবিতা পাঠ, অভিনয় ও স্বদেশী শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন।

গণচেতনার উন্মেষের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্থাপন করেন 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন'। তাঁর ভাষণে ব্রিটিশ শাসকদের স্বরূপ প্রকাশ পেতে লাগল। তার কিছুকাল পরে অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউম নামে জনৈক ইংরেজ সিভিলিয়ান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের একটা সভা ডাকতে পরামর্শ দেন। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বিখ্যাত ব্যারিস্টার। তাঁর সভাপতিত্বে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এই সভা ডাকা হল বোম্বাই শহরে। সভার নাম হল 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস'।

সাধারণ মানুষ বুঝতে পারল, আবেদন নিবেদনের পথে দেশের স্বাধীনতা আসবে না। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকদের হটাতে হলে চাই সশস্ত্র বিপ্লব। তাই গড়ে উঠল বহু গুপ্তসমিতি। ১৯0২ খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ ঘোষের পরামর্শে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্থাপন করেন 'ভবানী মন্দির'। প্রমথ মিত্র আর সরলাদেবী প্রতিষ্ঠা করলেন 'অনুশীলন সমিতি'। পুলিন দাসের নেতৃত্বে, ঢাকায় খোলা হল এর একটি শাখা। এ ছাড়া বিপ্লবী কার্যকলাপ চালাবার উদ্দেশ্য নিয়ে অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রতিষ্ঠা করলেন 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি'।

অবশ্য ১৯0৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এসব গুপ্ত সমিতির কাজ চলতো খুব গোপনে। লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট হয়ে এসেই বুঝতে পারলেন, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশী কাজ করছে বাঙালীর মস্তিষ্ক। তাই তিনি বাঙলাদেশকে টুকরো টুকরো করে বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে জুড়ে দিতে উদ্যোগী হলেন। ঠিক করলেন, ঢাকা চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগকে যোগ করা হবে আসামের সঙ্গে, আর পশ্চিমবাংলা হবে বিহার ও উড়িষ্যার অন্তর্ভূক্ত।

যেন বারুদের স্তূপে আগুন পড়ল। বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। সকলের পুরোভাগে এগিয়ে এলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। তিনি লিখলেন, 'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান।'

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর হল রাখী-বন্ধন উৎসব। বাংলাদেশের সর্বত্র সেদিন অরন্ধন পালিত হল। বঙ্গভঙ্গের ষড়যন্ত্র এভাবে রোধ হল। দেশবাসী দেশাত্মবোধের রাখী বন্ধনে বাঁধা পড়লেন। শুরু হল তীব্রতর সংগ্রাম। দেশের নেতারা বললেন, বিদেশী দ্রব্য বর্জন কর। স্বদেশী জিনিস গ্রহণ কর। ইংরেজ এই আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করতে বদ্ধপরিকর হলেন। জেলখানা ভর্তি হল। অনেক দেশপ্রেমিক ফাঁসি কাঠে প্রাণ হারালেন।

দেখতে দেখতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। অনেকে ভেবেছিলেন, যুদ্ধের পরে হয়ত দেশের স্বাধীনতা মিলবে। কেননা, এই যুদ্ধে অনেক সৈনিক ইংরেজদের সহযোগিতা করেছিলেন। তাঁর প্রতিদানে ভারতবাসীর ভাগ্যে জুটল আরও নিপীড়ণ, আরও অত্যাচার। কংগ্রেসের মঞ্চে এবার আবির্ভূত হলেন মহাত্মা গান্ধী। অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি স্বরাজ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হলেন।

গান্ধীজী দেখলেন, আইন করে ইংরেজ মানুষের অধিকার কেড়ে নিয়েছে, কাজেই সে আইন অমান্য করতে হবে। সারা দেশে সুরু হল আইন অমান্য আন্দোলন। ইংরেজ সরকার আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, গান্ধীজী, জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হলেন। সংগ্রাম অহিংসা ছেড়ে হিংসার পথ নিল। ইংরেজ সরকার এবার চুক্তি করলেন। ভারতের কয়েকটি প্রদেশে তৈরী হল মন্ত্রীসভা। দেশের মানুষের সাহায্য নিয়ে ইংরেজ তার শাসন চালিয়ে যেতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু গান্ধীজী কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে আত্মনিয়োগ করলেন, যারা অচ্ছুৎ তাদের সেবায়।

ইউরোপে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে গঠন করলেন নতুন দল। তারপর একদিন কোথায় যে তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন, কেউ জানতেও পারল না।

ইংরেজ সরকার এই যুদ্ধে ভারতবাসীর সাহায্য চাইলেন। গান্ধীজী বললেন, এই যুদ্ধে ভারতবর্ষ যোগ দিতে পারে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে; না হলে নয়। আলাপ আলোচনা চলল, কিন্তু সফল হল না। গান্ধীজী সংগ্রামের ডাক দিলেন। এই সংগ্রামের ধ্বনি হল, 'ইংরেজ ভারত ছাড়'। ফলে, নেতারা

বন্দী হলেন। কিন্তু 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শেষ হল না। এমন সময় খবর পাওয়া গেল, সুভাষচন্দ্র জার্মানীতে গিয়ে গড়ে তুলেছেন ভারতীয় মুক্তিবাহিনী। জাপান যুদ্ধে নেমেছে ইংরেজদের বিরুদ্ধে। সুভাষচন্দ্র জাপানের সহায়তায় আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করে ভারতের পূর্ব সীমান্তে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি ভারতবাসীর কাছে আহ্বান জানালেন, 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও। আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।'

তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা। সুভাষচন্দ্র তাঁদের নেতা, তাঁদের সেনাপতি। ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম করে তিনি ভারতের মাটিতে পা দিলেন। ভারতের মাটিতে উড়িয়ে দিলেন স্বাধীন ভারতের পতাকা। 'দিললী চলো' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মথিত করে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনাদল এগিয়ে চললেন দিল্লীর পথে, স্বাধীনতার পথে।

দুর্ভাগ্য আমাদের। প্রবল বর্ষায় রাস্তাঘাট চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ল। জাপান আত্মসমর্পণ করল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র কোথায় যে হারিয়ে গেলেন, কে জানে।

ইংরেজ বুঝলেন ভারতবর্ষের মানুষকে আর দমিয়ে রাখা যাবে না। বাধ্য হয়ে তারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু যাবার সময় তারা ভারতবর্ষকে দ্বিখন্ড করে দিয়ে গেলেন। মূল ভূখন্ডের নাম ভারত রইল ঠিকই, কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তের দুটি খন্ডাংশের নাম হল পাকিস্তান। এখন পূর্ব-পাকিস্তান বাংলাদেশ নামে নতুন রাষ্ট্র।

তবুও দুঃখের রজনী শেষ হল, এটাই আনন্দের কথা।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষের জন্ম হল স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে। এই রাষ্ট্রের জাতীয় পতাকার তিনটি রঙ—গেরুয়া, সাদা, সবুজ। গেরুয়া হল সাহস ও তেজের প্রতীক, সাদা শান্তি ও সত্যের প্রতীক, সবুজ শৌর্য ও বিশ্বাসের প্রতীক। সাদার ওপরে যে চক্র, উন্নতি ও প্রগতির চিহ্ন, ধর্ম ও ন্যায় শাসনের প্রতীকও এই চক্র।

।। পাঠ সহায়ক ।।

আলোচনা : আধুনিক বিশ্ব-ইতিহাসের এক তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে জাতীয়তাবোধের বিকাশ। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম, ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, ভারতের মুক্তি আন্দোলন—বিশ্ব-ইতিহাসের স্মরণীয় অধ্যায়।

ভারতীয়দের মধ্যে নানা অনৈক্য, বিবাসঘাতকতা ও জাতীয়তাবোধের অভাবের সুযোগ নিয়ে যেমন এদেশে ইংরেজরা জাঁকিয়ে বসে, ইংরেজ আমলেই আবার স্বদেশ চিন্তা, জাতীয় সংহতি ও ঐক্যবোধ প্রকট হয়ে ওঠে। শক্তিশালী বৃটিশের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের সুদীর্ঘ মহান সংগ্রাম শুরু হয়। লেখক ভারতের সেই মহান, ঘটনাবহুল বৈচিত্র্যময় স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী এখানে সহজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন [প্রতিটি দশ নম্বর]

১। ইংরেজ শিক্ষার সুফল কি কি ভাবে দেখা গেল ? ইংরেজী শিক্ষিত মানুষেরা কি বুঝিয়াছিলেন ? তাঁহাদের এই বুঝার প্রমাণ কি ?

[৪+৩+৩]

২। "যেন বারুদের স্তূপে আগুন পড়ল।"–লেখক বারুদের স্তূপ বলিতে কি বুঝাইয়াছেন ? আগুন কি ? ইহার ফলে কিরূপ আন্দোলন শুরু হইল ? কোন্ বিখ্যাত মানুষ ইহাতে আগাইয়া আসেন ? তিনি কিরূপে সহায়তা করেন ?

[২+২+৪+১+১]

৩। গান্ধীজী কেন আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন ? ঐ আন্দোলনে কোন্ কোন্ নেতা গ্রেপ্তার হইলেন ? ইংরেজ সরকারের চুক্তির ফলে কি হইল ? গান্ধীজী কি করিলেন ? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইবার সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র কি করিলেন ?

[২+২+২+২+২]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন [প্রতিটি ১ নম্বর]

১। রংগলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কি লিখলেন ? ২। আনন্দমঠ কাহার রচনা ? ৩। আনন্দমঠের সন্ন্যাসীরা কি উচ্চারণ করিলেন ? ৪। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবাসীকে কি বলিলেন ? ৫। ইউরোপে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলে ভারতবাসী কি দাবী করেন। ৬। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন কবে প্রতিষ্ঠিত হয় ? ৭। হিন্দুমেল কাহাদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৮। রাষ্ট্রগুরু কে ? তিনি কি প্রতিষ্ঠা করিলেন ? ৯। ভবানী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা কে ?

২। "তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা"–কাহার ডাকে ? কিরূপে সাড়া দিলেন ?

[১+২]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন [প্রতিটি আট নম্বর]

১। "চিন্তার মুক্তি যখন ঘটে, তখন তার বিকিরণ লক্ষ্য করা যায় সর্বত্র।"–চিন্তার মুক্তি বলিতে কি বোঝ ? ভারতে কখন চিন্তার মুক্তি আসে ? তাহার বিকিরণ কিভাবে দেখা যায় ?

[২+২+২]

২। "তবুও দুঃখের রজনী শেষ হইল এটাই আনন্দের কথা।"

দুঃখের রজনী বলিতে লেখক কি বুঝাইয়াছেন ? তাহা কিরূপে শেষ হইল ? আনন্দের কথা কেন বলা হইল ?

[২+২+২]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন [প্রতিটি এক নম্বর]

১। পদান্তর কর :– গঠন, জাগরণ, উৎসাহিত, রাজনৈতিক, ভারত, অতিক্রম।

২। লিংগান্তর কর :– বিখ্যাত, নেতা, ছাত্র, সভাপতি।

৪। বাক্যরচনা কর :– আগুন পড়া, প্রতীক সশস্ত্র, প্রতিষ্ঠা করা, ষড়যন্ত্র।

অভিধানিকা

পদ্যাংশ

রাম ভরতের মিলন/কৃত্তিবাস ওঝা

অপরাধে—দোষ, ত্রুটি।
মনোক্লেশ—মনের দুঃখ।
দাসবৎ—চাকরের মত।
অনুযোগ—দোষারোপ।
ত্বরিত—শীঘ্র, তাড়াতাড়ি।
প্রাণাধিক—জীবন অপেক্ষা প্রিয়

বঙ্গভূমির প্রতি/মধুসূদন দত্ত

দাস—চাকর, ভৃত্য, অধীন।
সাধ—আশা।
কোকনদ—রক্তপদ্ম।
ডরি—ভয় করি।
শমনে—মৃত্যুকে।
জন্মদে—জন্মধাত্রী, মা।

সংকল্প সাধন/হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ধায়—বয়ে যায়, ছুটে চলে।
শৈবাল—শেওলা।
সমরাঙ্গন—যুদ্ধক্ষেত্র।
সঙ্কল্প—স্থিরীকৃত কর্ম।
সার—শ্রেষ্ঠ, প্রধান।
সাধন—নির্বাহ, সম্পাদন।

প্রার্থনা/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মোরে—আমাকে
প্রার্থনা—আকাঙ্ক্ষা
ব্যথিত—ব্যথাতুর।
সহায়—অনুচর।
টুটে—ভঙ্গ হয়, নষ্ট হয়।
ক্ষতি—হানি।

নগরলক্ষ্মী/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দুর্ভিক্ষ—আকাল।
হাহাকার—আর্তনাদ।
অন্যদান—খাদ্যদান।
শেঠ—ধনী ব্যবসায়ী।
নিঃশ্বসিয়া—নিঃশ্বাস ফেলে।
দগ্ধ—পোড়া।
কঠিন—দুরূহ, শক্ত।
অক্ষম—অসমর্থ।

গঙ্গা-হৃদি বঙ্গভূমি/সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

গঙ্গাহৃদি—গঙ্গা হৃদয় যার।
বঙ্গভূমি—বাঙলাদেশ।
বৈরী—শত্রু।
নাগকেশর—বিশেষ ফুল।
আসিংহল—সিংহল পর্যন্ত।
অতন্দ্র—তন্দ্রাহীন, অনলস।

হতে পার্তেম/দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

গোলাগুলি—আগ্নেয়াস্ত্র।
পারিষদবর্গ—স্তবকের দল।
উঁচুদরের—সুখ্যাত সঙ্কল্প।
সাড়া—প্রত্যুত্তর।
ধাক্কা—অনুপ্রেরণা।
যেও সেও—যে কোন একজন।

জীবন ও সূর্য/কাজী নজরুল ইসলাম

লহর—ঢেউ, তরঙ্গ।
ঊর্ধ্বলোক—স্বর্গ।
শৌর্য—বীরত্ব, পরাক্রম।
গ্লানি—নিন্দা, অপবাদ।
দিগ্বিদিক—চতুর্দিক।
অবিশ্বাসী—প্রত্যয়হীনের।

লোক লজ্জা/কামিনী রায়

সঙ্কল্প—পণ।
আড়াল—বাঁধা।
প্রশমিতে—দূর করতে।
সংশয়—সন্দেহ।
নীরবে—গোপনে।
উপেক্ষা—অবজ্ঞা।

চাষার খেদ/যতীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত

পাইক—পেয়াদা, পদাতিক।
বেগার—বিনাবেতনে কাজ।
জো—বীজ বুনবার সময়।
চড়া—নদীর তীর বা মধ্যের নতুন জাগা ভূমি।
মোড়ল—সর্দার।

অপরূপ প্রতিশোধ/গোলাম মুস্তাফা

সমবেত—একত্রিত।
নবী—জ্ঞানী।
কোড়া—চাবুক।
পুলকে—আনন্দে।
অপরূপ—অভিনব।
আগুয়ান—যে এগিয়ে এসেছে।

গদ্যাংশ

স্বদেশী যুগের স্মৃতি/অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তাগিদ—বারবার চাওয়া, এখানে অনুপ্রেরণা।
আড্ডা—বৈঠক, মিলন স্থান।
নিজস্ব—স্বীয়, নিজের।
পাণ্ডা—প্রধান উদ্যোগী ব্যক্তি।
বরাভয়—আশীর্বাদ, আশ্বাস।

প্রাচীন বাঙলার গৌরব/হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

স্তব—আধাধনা।
জাঁকালো—সমারোহপূর্ণ।
যথাসর্বস্ব—সমস্ত ধনদৌলত।
শৈব—শিবের ওপাসনা করে যারা।
আকুল—কাতর, অস্থির।
আহ্লাদে আটখানা—খুশীতে ডগোমগো।

নতুন দা/শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কনকণে শীত—প্রবলশীত।
গলবন্ধ—গলায় জড়া বস্ত্র বিশেষ।
হুড়ার—নেকড়ে বাঘ।
সন্তর্পণে—সতর্কতার সঙ্গে।
চাঙ্গা—সুস্থ।
দাঁতখিচান—নিতান্ত অবজ্ঞা দেখান।
অগ্নিশর্মা—রাগে আগুনের মত তপ্ত হয়ে ওঠা।
আকণ্ঠ—গলাপর্যন্ত।
মেহনত—পরিশ্রম।

রামমোহনের স্মৃতি/দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংস্রব—মেলামেশা।
প্রশস্ত—চওড়া।
মগ্ন—ধ্যান, তন্ময়।
প্রশান্ত—সুস্থির, ধীর।
নিগূঢ়—গভীর।
পুত্তলিকা—পুতুল।

সেকেন্দারশাহের ভবিষ্যৎবাণী/দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

গুপ্তচর—যে গোপনে অন্যের সংবাদ সংগ্রহ করে। (spy)
বৈমাত্রেয়—বিমাতার পুত্রকন্যা।
দলিত—পিষ্ট।
মাসাধিক—একমাসের বেশি।
অভিপ্রায়—উদ্দেশ্য।
নির্বাসিত—বহিস্কৃত।
ক্ষিপ্রতর—দ্রুততর, আরও তাড়াতাড়ি।

কালাপাণির অভিজ্ঞতা/বিপিনচন্দ্র পাল

কালাপানি—সমুদ্র বা সমুদ্রের জল।
আয়োজন—বন্দোবস্ত।
প্রত্যুষে—খুব ভোরে।
বনাবনি—আপস, মেলামেশা।
ভীত—ভয়পাওয়া।
শীতকাতর—ঠাণ্ডায় পীড়িত।

নিউটনের তত্ত্ব/রমেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

ক্ষমতা—শক্তি, সামর্থ, প্রভাব।
তত্ত্ব—কোন বিষয় সম্পর্কে স্বরূপ জ্ঞান।
অকস্মাৎ—হটাৎ।
প্রান্ত—ধার, কিনারা।
রজ্জু—দড়ি।
রজ্জুবদ্ধ—দড়িতে বাঁধা।

মহালিখা রূপের পর্বতে অরণ্যে/বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শৈলশ্রেণী—পর্বতশ্রেণী।
শৈলসানু – অধিত্যকা।
চন্দ্রাতপ—চাঁদোয়া।
উত্তুঙ্গ—অতি উঁচু।
পাদপ—বৃক্ষ।
অনুরঞ্জিত—অনুরাগ যুক্ত।

এভারেস্ট অভিযান/নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

পরাজিত—ন্যূনকৃত, পরাভূত।
শৃঙ্গ—শিখর।
ব্যস্ত—ব্যগ্র।
স্পৃহা—আকাঙ্খা।
নিশান—প্রমাণ, চিহ্ন, অভিজ্ঞান।
দুর্গম—যেখানে চলা কষ্টসাধ্য।

মায়ের ডাক/চিত্তরঞ্জন দাশ

প্রবৃত্ত—নিযুক্ত।
অভিমান—অহঙ্কার, গর্ব।
সার্থক—সফল।
বড়াই—জাঁক।
নিয়ত—নিযুক্ত।
শুদ্ধচিত্তে—পবিত্র মনে।

শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত/স্বামী বিবেকানন্দ

বিস্তৃত—প্রসারিত।
নিষ্ঠাবান—শুদ্ধাচারী।
সমুদয়—যাবতীয়, সব।
সংস্থানের—সংগ্রহের।
অধিকার—দখল।
তমোরাশি—অন্ধকার।
মহাসমাধিস্থ—দেহত্যাক্ত, মৃত।
অভ্যুদয়—আবির্ভাব, জন্ম।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম/দক্ষিণারঞ্জন বসু

সূত্রপাত—আরম্ভ।
প্রমাদ—বিপদ, পরমাদ।
স্বদেশী—নিজের দেশে উৎপন্ন।
স্বরাজ—স্বদেশবাসী কর্তৃক দেশশাসন।